প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের অবস্থান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও রাজবংশী জনসমাজ

প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের অবস্থান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও রাজবংশী জনসমাজ

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশে অবস্থিত মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, দার্জিলিং, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চল 'উত্তরবঙ্গ' নামে চিহ্নিত। উত্তরবঙ্গের পরিচয় দিতে গিয়ে নির্মল দাশ লিখেছেন— "উত্তরবঙ্গ বললে এখন সাধারণভাবে দেশের যে এলাকাকে আমরা বুঝি, সুদূর অতীতে তো বটেই, এমনকি অদূর অতীতেও সেই এলাকার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে ছিল। সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভূ-খণ্ডে ইংরেজের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার উত্তরে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমের সমতল এলাকায় একটি অখণ্ড রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভৌগোলিক এলাকার সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। শুধু সমতল এলাকাতেই নয়, ইংরেজের আত্মপ্রসারশীল উদ্যোগেই সিকিম ও ভুটানের মত সংলগ্ন পার্বত্য এলাকারও কিছু কিছু অংশ ক্রমে এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রিটিশ শাসনকর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই ভাবে মূলতঃ ব্রিটিশ আমলেই সমতল ও পার্বত্য এলাকা-সমন্বিত বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটা ভৌগোলিক প্রাক্‌রূপ প্রথম আভাসিত হয়ে ওঠে।"[১] অর্থাৎ গঙ্গার উত্তরাংশ এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশের যে সমতলভূমি এবং মাঝখানের পার্বত্যভূমির কিছু অংশ নিয়েই উত্তরবঙ্গ গঠিত।

ইংরেজ শাসনের সময় প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য বঙ্গভূমির নাম দিয়েছিলেন বঙ্গ প্রেসিডেন্সি বা বঙ্গপ্রদেশ। আবার প্রান্তীয় অবস্থানের উপর ভিত্তি করেই বঙ্গের দক্ষিণ অংশকে দক্ষিণবঙ্গ, উত্তর অংশকে উত্তরবঙ্গ, পূর্ব ভাগকে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিম ভাগকে পশ্চিমবঙ্গ বলা হয়। ১৯৪৭ খ্রিঃ ১৫ আগস্ট দেশভাগ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তানের। দেশ বিভাগের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পাবনা রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর এবং

পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন চারটি জেলা সহ অঞ্চলটি উত্তরবঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। এই চারটি জেলা হল দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। ১৯৪৭ সালের পর অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হবার পরেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে উত্তরবঙ্গের সীমানার কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। কেননা, দেশীয় রাজ্য কোচবিহার ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ভারত সরকারের অধীন হয় এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে পশ্চিমবঙ্গের দেশীয় রাজ্য কোচবিহার জেলা হিসেবে পরিগণিত হয়। আবার অন্যদিকে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ১৯৫৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। আরও পরে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য পশ্চিম দিনাজপুর জেলাটিকে ভাগ করে দুটি জেলা করা হয়— উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের পর বর্তমান উত্তরবঙ্গ বলতে বোঝায় ছয়টি জেলাকে, যার প্রশাসনিক নাম কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা। এই ছয়টি জেলার সমষ্টিই হল বর্তমান উত্তরবঙ্গ।

উত্তরবঙ্গ স্থানের প্রশাসনিক নাম 'জলপাইগুড়ি ডিভিশন' হলেও মৌখিক নাম উত্তরবঙ্গ, যা বেশি জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত। আর বহুল প্রচলিত বলেই বিভিন্ন সংস্থা; প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'উত্তরবঙ্গ' নামটি যুক্ত। এ প্রসঙ্গে নির্মল দাশ লিখেছেন— ''সম্ভবত ব্রিটিশ আমল থেকেই এই আঞ্চলিকতা বাচক উত্তরবঙ্গ/নর্থবেঙ্গল অভিধাটি লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে এবং লোকের মনে এই প্রথানুগত্য এত প্রবল যে দেশবিভাগের পর যখন গোটা রাজ্যটিরই নাম দাঁড়াল পশ্চিমবঙ্গ/ওয়েস্টবেঙ্গল, তখনও উত্তরবঙ্গ/নর্থবেঙ্গল নামটি অব্যাহত রয়ে গেল লোকের মুখে মুখে। শুধু মুখে মুখেই নয়, দেশ বিভাগের পর উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনের নামকরণ করা হল নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং সরকারী পরিবহন সংস্থার নাম হল 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা'। এই সমস্ত নামই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারিত। এই সব প্রাতিষ্ঠানিক নাম

থেকে বোঝা যায় উত্তরবঙ্গ/নর্থবেঙ্গল নামটির কোনো আনুষ্ঠানিক তথা প্রশাসনিক স্বীকৃতি না থাকলেও এই নাম সম্পর্কে জনগণের মৌখিক প্রথানুগত্যকে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে। তাছাড়া সাহিত্য, সাংবাদিকতা এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে 'উত্তরবঙ্গ' শব্দটি আজ লিখিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।"[২] সাম্প্রতিককালে 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদ' প্রশাসনিক স্বীকৃতির অন্যতম নিদর্শন।

উত্তরবঙ্গ নামের উৎপত্তির পাশাপাশি এর ভৌগোলিক সীমারেখা সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়া প্রয়োজন। এই উত্তরবঙ্গের চারপাশে রয়েছে নানান রাজ্য ও রাষ্ট্র। উত্তরবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি হল, উত্তরে সিকিম, পশ্চিমে বিহার ও পূর্বদিকে অসম। আর প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি হল, উত্তরে ভুটান, পশ্চিমে নেপাল, পূর্বদিকে বাংলাদেশ। আয়তনের দিক থেকে উত্তরবঙ্গের অবস্থান সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের এক চতুর্থাংশ। অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আয়তন হল ৮৭,৮৫৩ বর্গ কিঃ মি। সেখানে উত্তরবঙ্গের আয়তন ২১,৬২৫ বর্গ কিঃ মি। জেলাগুলির মধ্যে আয়তনের দিক থেকে বৃহত্তম হল জলপাইগুড়ি জেলা, যার আয়তন ৬,২৪৫ বর্গ কিলোমিটার। ক্রমান্বয়ে বাকি জেলাগুলি হল— মালদা, যার আয়তন ৩,৭১৩ বর্গ কিলোমিটার, কোচবিহার ৩,৩৮৬ বর্গ কিলোমিটার, দার্জিলিং ৩,১৪৯ বর্গ কিলোমিটার উত্তর দিনাজপুর ৩,১৩৯ বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের আয়তন ২,২১৯ বর্গ কিলোমিটার । দার্জিলিং জেলার দক্ষিণাংশের পরে যে অংশ রয়েছে তা উত্তর-দক্ষিণে অনেকটা প্রলম্বিত বলে তুলনামূলক ভাবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার চেয়ে দুই দিনাজপুর অনেকটা শীর্ণাকৃতি।

ক. ভু-প্রকৃতি ঃ

ভূ-প্রকৃতির দিক থেকেও উত্তরবঙ্গ বৈচিত্র্যময়। এদিক থেকে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা—

১. পার্বত্য অঞ্চল ও তরাই অঞ্চল ঃ প্রায় সমগ্র দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলার

কিছু অংশ নিয়ে গঠিত।

২. ডুয়ার্স অঞ্চল ঃ কোচবিহার ও প্রায় সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। আবার ডুয়ার্স বলতে তিস্তা নদীর বাম তীর থেকে সংকোশ নদীর ডান তীর পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্যবর্তী অঞ্চলকে ডুয়ার্স বলা হয়।

৩. বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চল ঃ সমগ্র উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা এবং কোচবিহার জেলার অধিকাংশ জায়গা জুড়ে এই অঞ্চল বিস্তৃত। ভূ-প্রকৃতি ভেদে এখানকার মানুষদের জীবনপ্রণালী, সংস্কৃতির কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয়, চাষ আবাদের ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষ করার মতো। খাদ্য ও পোষাকের দিক থেকেও পার্থক্য লক্ষণীয়।

ফ্রান্সিস বুকানন-এর বিবরণ হ্যামিল্টনের রংপুর জেলা বৃত্তান্ত থেকে আমরা এই অঞ্চলের আবহাওয়াগত তথ্য পাই। সেখানে উল্লেখ আছে যে পূর্বে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড-এর বেশি কখনোই হত না। কিন্তু আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে বর্তমান তাপমাত্রার সঙ্গে এর যোগসূত্র খুবই কম। তার কারণ হিসেবে অবশ্য বিশ্ব উষ্ণায়নকেই দায়ী করা হয়। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস এবং অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাতের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস, বৃষ্টিপাতের সংখ্যার ঘাটতি এবং অনিয়মিত বৃষ্টি এই অঞ্চলের ভূ- প্রকৃতি, জীবজন্তু এবং জীবনযাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। লক্ষণীয় যে বক্সা অরণ্য এক সময় গুল্মজাতীয় উদ্ভিদে ভর্তি ছিল তা এখন মাটির শুষ্কতার জন্য অনেকটাই কম।

এছাড়াও এই সব অঞ্চলে এমন সব প্রাণীর বসবাস ছিল তারা আজ লুপ্তপ্রায়। তবুও সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে উত্তরবঙ্গ এগিয়ে। কেননা, এখনও অনেক মূল্যবান উদ্ভিদ এই উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়। যার মধ্যে উল্লেখ্য সিঙ্কোনা, সর্পগন্ধা, আমলকি, বহেরা ইত্যাদি। উত্তরবঙ্গ মূলতঃ হিমালয়ের পাদদেশে হবার ফলেই হিমালয়ের প্রভাব সমগ্র উত্তরবঙ্গে দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের প্রান্তেই অবস্থিত শৈলশহর দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পঙ, মংপু, বক্সা,

জয়ন্তী ইত্যাদি পাহাড়। শুধু তাই নয়, এই মোহময় শৈলশহরের নিচেই অবস্থিত বিস্তীর্ণ বনভূমি— অভয়ারণ্য। এই বনভূমি যেন গা ছমছম রূপসী জঙ্গল যা দুর্ভেদ্য। এখানে যেমন একদিকে রয়েছে শাল, সেগুন, শিমূল, গামার, মেহেগনি, পলাশ, বট, পাকুড়, জারুল, দেবদারু, শিরিষ, বকুল, অর্জুন, আম, কাঁঠাল, কদম তেমনি অন্যদিকে বাঁশঝাড়, বেতবন, কাশবন, নল খাগড়া, লতা-গুল্ম দিয়ে যেন কেউ সাজিয়ে তুলেছে। এই সব অভয়ারণ্যগুলি হল চিলাপাতা, জলদাপাড়া, বৈকুণ্ঠপুর, গরুমারা প্রভৃতি। এখানে লুপ্তপ্রায় একশৃঙ্গি গণ্ডার, খরগোশ, হাতি, চিতা, বাঘ, হরিণ, পাইথন প্রভৃতি জীবজন্তু বাস করে। এছাড়াও রয়েছে 'কুলিক পক্ষীনিবাস'। যেখানে মনের আনন্দে ময়ূর, শালিক, পায়রা, টিয়া, ময়না, খঞ্জনা, বুলবুলি ধনেশ প্রভৃতি পাখি উড়ে বেড়ায়। শান্তির নীড় রূপে যেন তারা এই উত্তরবঙ্গকেই বেছে নিয়েছে। সারা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত ধরনের পশুপাখির বাস যেন এই উত্তরবঙ্গে।

খ. নদ-নদী ঃ

উত্তরবঙ্গ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে যে কোনো উন্নত দেশগুলির সঙ্গে তুলনীয়। কেননা, উত্তরবঙ্গের একটা অংশ যেমন পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এবং এর পাদদেশ যেমন অভয়ারণ্যে আবৃত, ঠিক তেমনি সমতল ভূমিও যেন নদী দ্বারা বেষ্টিত। কেননা, পার্বত্য অঞ্চলকে অতিক্রম করে উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় নদী। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের সীমারেখা হিসেবে নদীকেই চিহ্নিত করা হয়েছে— গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অববাহিকা অঞ্চল।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদী হল তোর্ষা ও তিস্তা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল— কালজানি, ধরলা, মানসাই, সঙ্কোশ, গদাধর ইত্যাদি। তবে কালজানি, ধরলা ও তোর্ষা তীরবর্তী মানুষেরা অনেকাংশেই এই সব নদীগুলির উপর নির্ভর করেই জীবন নির্বাহ করে। অনেক সময় এগুলি আবার তাদের জীবনে অভিশাপ রূপেই দেখা দেয়। তোর্ষা নদীকে এতদঞ্চলে মুসলমানদের পীর দেবতা রূপে পূজা করা হয়। এজন্য তোর্ষা পুরুষ দেবতা।

এই নদীকে ঘিরে পার্শ্ববর্তী মানুষের মনে নানা লোকবিশ্বাস ও লোককাহিনি তৈরি হয়েছে। কোচবিহার জেলার নদীগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই একই নদী স্থানভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। যেমন— জলঢাকা নদীটি জলপাইগুড়ি পার হয়ে যখন কোচবিহারে প্রবেশ করল তখন তার নাম হয়ে গেল মানসাই। আরও পরে এই নদীটি সিঙ্গি মারী নামে পরিচিত যা দিনহাটা ও সিতাইকে আলাদা করে দিয়েছে। এই সিঙ্গিমারী, তোর্ষা ও মানসাইয়ের মিলিত স্রোত ধরলা নামে পরিচিত। আবার তুফানগঞ্জ মহকুমার যে কালজানি নদীটির পরিচয় পাওয়া যায় সেটিও পাহাড়ে ভিন্ন নামে পরিচিত। তবে কোচবিহার জেলার এই সব নদীর গতিপথ বারবার পরিবর্তন হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকালে এই সব নদীর মাধ্যমে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য হত— যা দেশ স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকে বন্ধ।

জলপাইগুড়ি জেলাতে নদ-নদীর সংখ্যা একটু বেশি। মানুষের শরীরের শিরা-উপশিরার মতোই এখানকার নদীগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত একমাত্র তিস্তা নদীই হল উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় নদী। তিস্তা পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে যতই সমতলের দিকে এগিয়ে গিয়েছে ততই তা বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে। যা সমতলের মানুষের জীবনের প্রলয় স্বরূপ। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নদীগুলি থেকে তিস্তার জল বহনের ক্ষমতা অনেক বেশি। যার ফলে তিস্তার পাশে উত্তরবঙ্গের বাকি নদীগুলি অনেকটাই ম্লান। বর্ষায় ভয়ঙ্কর রূপে তিস্তা দেখা দেয় বলে তিস্তা তীরবর্তী মানুষেরা একে 'তিস্তাবুড়ি' জ্ঞানে পূজা করে। তোর্ষা নদীর মতোই তিস্তাকে কেন্দ্র করেও এতদঞ্চলের মানুষের মনে নানান লোককথা, লোককাহিনির সঞ্চার হয়েছে। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যে ও লোকসংস্কৃতিতে স্বভাবতই তিস্তা সহ এখানকার অন্যান্য নদীগুলি একটা উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। তিস্তার আদি নাম ত্রিস্রোতা। পুরাণেও আমরা (কালিকাপুরাণ) এই তিস্তার প্রসঙ্গ পাই। তিস্তার উৎপত্তি সম্পর্কে এতদঞ্চলে যে লোককাহিনি প্রচলিত আছে তা হল দেবী পার্বতীর বক্ষ থেকে তিনটি স্রোত নেমে এসে তিস্তার জন্ম হয়েছে এজন্য তিস্তা ত্রিস্রোতা। বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য এখানকার মানুষেরা তিস্তার কাছে

মানত করে এবং পূজা করে। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার রায়ডাক, জলঢাকা, মুজনাই নদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলঢাকা নদীর উপর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এছাড়া রায়ডাক নদী তীরবর্তী শিশুকাঠ ভারতবিখ্যাত। মুজনাই ফালাকাটার পাশ দিয়ে বয়ে চলে যায়। এই জেলার করতোয়া, তালমা, সাহু, করলা, সাঞ্জাই, গিলাণ্ডি প্রভৃতি নদীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয়, এইসব নদীকে কেন্দ্র করেও নানান 'মিথ' গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ড. দীপককুমার রায় লিখেছেন— "লৌকিক শিবের আত্মীয়-স্বজন তথা পরিবার নানা দিকে ছড়িয়ে আছে। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার উত্তরাংশে কাসিমচরা (পানবাড়ি) নামক স্থানের মিথ লৌকিক দেবী 'কুলাঢাকি' শিবের বোন এবং তিস্তাবুড়ি দেবীও শিবের পরিবারের একজন। তিস্তাবুড়ির স্বামী ধরলা নদী বা বুড়া ধল্যা বা বুড়া কর্তা ঠাকুর। তাদের ছেলে ও মেয়ে যথাক্রমে করলা (নদী) এবং দুলালী। বর্তমানে দুলালী জলপাইগুড়ি শহরের আদরপাড়ায় দুলালী দিঘি নামে চিহ্নিত। আবার ভিন্ন মিথ কথায় তিস্তাবুড়িরা তিন বোন, অন্য দুই বোন গিলাণ্ডী বুড়ি (নদী) যিনি ধূপগুড়ির সন্নিহিত অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। অপরজন সাঞ্জাইবুড়ি যিনি আলিপুরদুয়ার মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম দিয়ে প্রবাহিত।"[৩] এছাড়াও কথিত আছে করতোয়া নদী প্রাচীন কামতাপুর রাজ্যের সীমানা ছিল। যার উপর দিয়ে দেবী চৌধুরাণীর বজরা যাওয়া আসা করত।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ নদীই হিমালয় থেকে আগত। এই সব নদীর মধ্যে মহানন্দা, বালাসন, মেচি প্রধান। দার্জিলিং জেলার বড় নদী মহানন্দা। এটি কার্শিয়াঙের কাছে পাগলাঝোরা থেকে উৎপত্তি হয় এবং এরপর শিলিগুড়ি হয়ে বাংলাদেশে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তবে মহানন্দা যে প্রাচীনা নদী তার প্রমাণ বহু পুরাণে পাওয়া যায়। বর্তমান পাহাড় থেকে প্রচুর পরিমান পলি, বালি বহন করতে করতে মহানন্দা পূর্বের যৌবন হারিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, এই সব পলি, বালি, পাথর বহন করে সমতল ভূমিতে নিয়ে আসার ফলে চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়া বালাসন নদী এখানকার স্থানীয় মানুষদের জীবিকা অর্জনের উপায় হয়ে উঠেছে।

এছাড়াও উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর জেলায় যে সমস্ত নদী রয়েছে সেগুলি হল আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, সুই, নাগর ইত্যাদি। নাগর নদীটি মহানন্দার উপনদী। যার উৎস বাংলাদেশের নিম্ন জলাভূমি। এর আবার দুটি উপনদী রয়েছে— নোনাই ও কুলিক। এই কুলিক নদীর তীরে বর্তমান 'কুলিক পক্ষী নিবাস' গড়ে উঠেছে। এছাড়া টাঙ্গন নদীর উল্লেখ আমরা মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাই। এই জেলার উল্লেখযোগ্য আরও দুটো প্রাচীন নদী হল আত্রেয়ী ও পুনর্ভবা। এই দুটি নদীকে কেন্দ্র করেও নানান মিথ গড়ে উঠেছে। আত্রেয়ীকে শিবের কন্যা রূপে মনে করে, পূজা করে স্থানীয় বাসিন্দারা। বর্ষাকালে আত্রেয়ী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

মালদা জেলার নদীগুলি হল যথাক্রমে বেহুলা, মহানন্দা, কালিন্দী, ভাগীরথি ইত্যাদি। কালিন্দী গঙ্গা নদীর একটি শাখা, যা পরবর্তীকালে বেহুলা নামে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে। এই বেহুলাকে কেন্দ্র করে এই সব অঞ্চলে নানান লোককথা প্রচলিত আছে। মনসামঙ্গলের কাহিনিতে আমরা দেখি বেহুলা মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে চলে। ভেসে যাবার সময় এরা কালিন্দী নদী হয়ে এই নদীতে এসেছিল বলে এই নদীর নাম বেহুলা।

নদ-নদী অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। এরা কৃষিজীবী হলেও উত্তরবঙ্গের ভূমি সর্বত্র চাষের অনুকূল নয়। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহারের কিছু অংশ পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে কাঁকড়ের পরিমান বেশি থাকে। তাই এখানকার জমি চাষের পক্ষে বাকি জেলাগুলি থেকে প্রতিকূল। এজন্য পর্বতের পাদদেশ সংলগ্ন জমি ঢালু হওয়ায় সেখানে চা ও কমলালেবু ভালো হয়। অন্যদিকে সমতল ভূমিতে ধান, গম, পাট প্রভৃতি রবিশস্য ও খারিফ শস্য চাষ হয়। এছাড়া কোচবিহার জেলা তামাক চাষের জন্য বিখ্যাত।

গ. উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ঃ

২০০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ১,৪৭,২২,১৫

জন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে জলপাইগুড়ি জেলায়। যার জনসংখ্যা ৩৪,০৩,২০৪ জন। এছাড়াও জনসংখ্যার দিক থেকে ক্রমান্বয়ে বাকি জেলাগুলি হল— মালদা, যেখানে মোট জনসংখ্যা ৩২,৯০,১৬০ জন, কোচবিহার জেলা, যার জনসংখ্যা ২৪,৭৮,২৮০ জন, উত্তর দিনাজপুর ২৪,৪১,৮২৪ জন; দার্জিলিং ১৬,০৫,৯০০ জন এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকসংখ্যা ১৫,০২,৬৪৭ জন। এই জনসংখ্যা নির্দিষ্ট স্থানে স্থির কোনো দিনই থাকবে না, দিন যতই এগিয়ে যাবে ততই এ সংখ্যা বাড়তে থাকবে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্পর্কে নির্মল দাশ বলেছেন— "ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আরও একটি উল্লেখ করতে হয়, তা হল উত্তরবঙ্গের নতুন নতুন শহর ও শাহরিক পুঞ্জায়নের (urban agglomeration) পত্তন। এই নতুন শাহরিক জনসংখ্যার বিন্যাস অবশ্য উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় সুষম নয়। ১৯৮১ সালের জনগণনার প্রাথমিক বিবরণ অনুসারে দেখা যায় ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের দশবার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার "has been of normal order by and large" (উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা ১৯৭১-এ ৭৪,১৮,৬৬৩, ১৯৮১ -তে ৯৪,২২,৮৫৫)। কিন্তু জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় (বিশেষত শিলিগুড়ি এলাকায়) শাহরিক জনসংখ্যার হারে তীব্র বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়।"[৪]

সারা ভারতবর্ষে মোট যতগুলি জাতি-জনজাতি রয়েছে তার অধিকাংশ জাতি-জনজাতির বাস এই উত্তরবঙ্গে। সেদিক থেকে আমরা উত্তরবঙ্গকে সমগ্র ভারতের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলতে পারি। স্বাধীনতার আগে জীবন-জীবিকার সূত্রে কয়েক'শ জাতি-জনজাতি উত্তরবঙ্গে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করে। প্রাচীনকাল থেকেই এখানে আর্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় শাখার মানুষেরা বাস করছে। এছাড়াও দেশবিভাগের ফলে বহু মানুষ এই উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস স্থাপন করেন। সেক্ষেত্রে জনবসতির দিক থেকেও এই উত্তরবঙ্গ বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। ফলে, জনবিন্যাসের এই বিচিত্রতা ক্রমেই ছাপ ফেলেছে এতদ্‌ঞ্চলের বহমান সংস্কৃতিতে, লোকসংস্কৃতিতে। এখানে এমন কতগুলি জনজাতির বাস রয়েছে সারা পৃথিবীতে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

এরকমই একটি জনজাতি হল টোটো, যারা একমাত্র উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় টোটোপাড়ায় বাস করে। এছাড়া রয়েছে কোচ, মেচ, রাভা, সাঁওতাল, মুণ্ডা, খারিয়া, ওরাওঁ, বরাইক, লোহার, ধিমাল, তামাং, গুরুং, শেরপা, লেপচা, নেপালি, মালপাহাড়িয়া প্রভৃতি। এদের অধিকাংশরা পার্বত্য অঞ্চলের চা-বাগানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এছাড়াও দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকেও অনেকেই এই উত্তরবঙ্গে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। নিচে প্রধান প্রধান জাতি-জনজাতিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল।

কোচ ঃ

উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যারা দীর্ঘদিন থেকে বাস করেন তাদের মধ্যে কোচ'রা উল্লেখ্য। কোচ'রা এই অঞ্চলের এক প্রাচীন জনজাতি। এরা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর। পরবর্তীকালে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের সঙ্গে এদের মেলবন্ধন ঘটে। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে কোচ'রা এসেছিল কম্বোজ থেকে, তাই এদের নাম কোচ। ১৮৭২-১৯০১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী কোচ ও রাজবংশীকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে এরা পরস্পরের থেকে আলাদা হয়ে যায়। তবে উভয় সম্প্রদায়কে বর্তমান তফসিলি উপজাতি বলে স্বীকৃতি না দিয়ে তফসিলি জাতির স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উভয় সম্প্রদায়ের শরীরের গঠন, ভাষা, পূজা-পার্বণ, আচার-আচরণ ইত্যাদি থেকে এদের অভিন্ন বলে মনে করা হয়। উপেন্দ্রনাথ বর্মণ 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' গ্রন্থে এদেরকে পৃথক বলে মনে করেছেন।

রাজবংশী ঃ

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হল রাজবংশী। উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই এদের বাস। বর্তমানে স্থানীয় রাজবংশীরা নিজেদের কোচরাজার বংশধর বলেই মনে করেন। রাজার বংশধর বলে এরা রাজবংশী এমনটাই মনে করেন। যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে এরা উত্তরবঙ্গের মাটিতে বাস করেন

তাই এখানকার আবহাওয়া জলবায়ুর সঙ্গে এরা পরিচিত হয়ে উঠেছে। তবে এদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি আছে। যে সংস্কৃতিতে তাঁদের কতগুলো পূজা-পার্বণ, খাদ্যাভ্যাস, রীতি-নীতি রয়েছে যা একান্ত ভাবেই তাঁদের নিজস্ব। পুরাণ থেকে জানা যায় যে জামদগ্নির পুত্র পরশুরাম দ্বারা একবিংশতিবার ক্ষত্রিয় নিধন কার্য্য সংঘটিত করলেও উক্ত পরশুরাম ক্ষত্রিয়দের নিঃশেষ করতে পারেনি। এই জামদগ্নির পুত্রের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়গণ জল্পেশ দেবের শরণাগত হয়। কালিকাপুরাণের সপ্ততিতম অধ্যায় ৩০ নং শ্লোক থেকে আমরা উপরের বর্ণিত তথ্য জানতে পারি। আবার ভ্রামরীতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে দেখতে পাই, নন্দীসুতের ভয়ে ভীত বর্দ্ধনের পঞ্চপুত্র জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবসহ পৌণ্ড্রদেশ থেকে রত্নপীঠে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই রত্নপীঠে আত্মগোপনকারী ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মচ্যুত হয়ে ম্লেচ্ছরূপ ধারণ করে। পৌরাণিক যুগের পর প্রাচীনকালেও এই পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের উপর অসংখ্যবার আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। এরাই পৃথিবীতে রাজবংশী ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত।

মেচ ঃ

উত্তরবঙ্গের এক প্রাচীন জনজাতি হল মেচ। এদের বাস উত্তরবঙ্গের সর্বত্র হলেও কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং অসমে এদের বসবাস বেশি দেখা যায়। মেচ ভাষাকে বোড়ো ভাষা বলা হয়। তরাই অঞ্চলের ' মেচি' নদীর তীরে এদের বাস ছিল বলে এদেরকে মেচ বলা হত। তাঁদের এই নাম নিয়ে অবশ্য সেই সব স্থানে মিথ প্রচলিত আছে। তা হল রাজা যযাতির পুত্র তর্বসুর ও অন্যান্য সন্তানগণ জাতিচ্যুত ' ম্লেচ্ছ' বলে পরিগণিত হন। এই ম্লেচ্ছ কথাটিই অপভ্রংশ হয়ে মেচ হয়েছে। এদের ভাষা ভোটচীনী গোষ্ঠীর ভাষা।

এঁরা মূলতঃ প্রকৃতির উপাসক। এদের প্রধান দেবতা বাথৌ, যার অবস্থান প্রত্যেকটি মেচ বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণের সিজ গাছ-এ এবং এদের প্রধান দেবী 'মাইনাও'। বৈশাখ মাসে বাথৌ দেবতার পূজা হয়, এই পূজায় বলি প্রথা প্রচলিত। যে কোনো পূজাতেই মদ আবশ্যিক উপাদান।

LIBRARY NBU, DARJEELING

272107

এদের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। মেচ রমণীরা এণ্ডি চাষ ও তাঁত শিল্পে পারদর্শী। দখনা প্রস্তুত করতে এরা সিদ্ধহস্ত, যা মেচ রমণীরাই পরিধান করত। মেচদের অনেকগুলি পদবী রয়েছে। সেসব হল মোচারী, বসুমাতা, নার্জিনারী ইত্যাদি।

রাভা ঃ

রাভা উপজাতি মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর শাখা। জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসম, মেঘালয়ে রাভাদের বাসস্থান। রাভারা যে ভাষায় কথা বলে সেই ভাষা রাভা ভাষা নামে পরিচিত। এদের নিজস্ব কোনো লিপি নেই।

রাভাদের সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। মেয়েরাই সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক-বাহক। এ কারণেই ছেলে-মেয়েদের গোত্র পরিচয় মায়ের গোত্র অনুযায়ীই হয়। এমনকি বিবাহের পরও ছেলেদের গোত্রের পরিবর্তন হয় এবং পরবর্তীকালে মেয়েরাই সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করেন।

স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে সৃষ্টি কর্তা রূপে এরা এদের প্রধান দেবতা রূপে 'ঋষি'র পূজা করেন। এছাড়া 'রীন্তক' এদের প্রধান স্ত্রী দেবতা। প্রত্যেকটি রাভা পরিবারে এই দেবতার পূজা হয়। 'রীন্তক' রাভাদের গৃহকোণে অবস্থিত শস্যপূর্ণ একটি মাটির কলস তার প্রতীক। এছাড়াও রাভাদের প্রতিটি বাড়িতে রয়েছে যখা-যখানি'র স্থান। এরা প্রতীকী পূজা করে, পূর্বে মূর্তি পূজা এঁদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না কিন্তু বর্তমানে মূর্তি পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে। এদের প্রধান খাদ্য ভাত হলেও নিজেদের তৈরি করা মদ প্রধান মাদক দ্রব্য।

ধিমাল ঃ

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নক্সালবাড়ি এবং পাহাড়ে খুব অল্প সংখ্যক ধিমাল উপজাতি বাস করে। এরা জনজাতি হলেও এখনও তফসিলি উপজাতি হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পায় নি। ধিমাল গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের পদবী মল্লিক। ধিমাল সমাজে সগোত্রে বিবাহ হয় না। বিধবা বিবাহেরও

প্রচলন দেখা যায় না এই সমাজে। ধিমালদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে কিন্তু লিপি নেই, তবে নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে।

ওরাওঁ ঃ

বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের বাসিন্দা ওরাওঁ সম্প্রদায়ের মানুষেরা চা বাগানের কাজের প্রয়োজনেই ডুয়ার্স অঞ্চলে আসেন। ডুয়ার্সেই এদের বসবাস বেশি দেখা যায়। কিন্তু বর্তমানে এরা উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বসবাস করে। ওরাওঁদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে — কুরুখ ভাষা। এদের কোনো লিপি নেই। নিজেদের মধ্যে এরা কুরুখ ভাষায় কথা বলে।

ওরাওঁ সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। এদের প্রধান দেবতা করম। ঝাড়ফুক এরা বিশ্বাস করেন। এদের আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব 'শারণ্য' উৎসব। এই উৎসবে যে নৃত্যগীত হয় তাতে মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ যা অনেকটা রাজবংশীদের মদনকাম পূজার মত। এদের কতগুলি গোত্র রয়েছে যা কতগুলো জীবজন্তুর নামে। যেমন— টপ্পো যার অর্থ পাখি, খাগা - যার অর্থ কাক ইত্যাদি। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ওরাওঁরা বাঙালিদের সঙ্গে পারস্পরিক মেলামেশার ফলে এদের সংস্কৃতির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

টোটো ঃ

সারা বিশ্বের আদিম জনজাতি হল টোটো। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমার মাদারিহাট থানার ভারত ভুটান সীমান্তে টোটোপাড়া অবস্থিত। এরা মূলতঃ টিবেট মঙ্গোলয়েড জাতির শাখা। এদের মোট ১৩টি গোত্র রয়েছে। প্রথম যে ১৩জন টোটো সম্প্রদায়ের লোক এই পাড়ায় বসতি স্থাপন করে তাঁরাই পরে গোত্রে পরিণত হয়। এইসব গোত্রগুলি হল দান্‌কো- বে, বঙ্গো-ব ইত্যাদি।

কাউন, ভুট্টা টোটোদের প্রধান খাদ্যশস্য। ১৯০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী সংখ্যা ছিল

মোট ১৭১ জন, ২০০১ সালে যার সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৭৫ জন। এরা কাউন ভাত পচিয়ে 'ইউ' নামে এক ধরনের মাদকদ্রব্য তৈরি করে যা বড় কলসি বা বাঁশের চোঙের মধ্যে সঞ্চিত রাখে।

টোটোরা ছিল প্রকৃতির উপাসক। এদের প্রধান দেবতা 'ইশপা'। এই দেবতা একই সঙ্গে নারী ও পুরুষ। এই দেবতা আসলে মহাকাল। টোটোদের সবচেয়ে বড় পূজা হল ওমচু পূজা ও মায়ু পূজা। নতুন ফসল ওঠার সময় এরা এই ওমচু পূজা করে থাকে।

সাঁওতাল ঃ

বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চল থেকে চা চাষ করার জন্য সাঁওতালরা ডুয়ার্স অঞ্চলে আসে। বর্তমান তরাই অঞ্চল সহ উত্তরবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই এঁদের বাস, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতিদের মধ্যে সাঁওতালদের মোট তেরোটি গোত্র রয়েছে। এগুলি হল সরেন, বাস্কে, হাসদা, কিস্কু, বেসরা, টুডু, মুর্মু, হেমব্রম ইত্যাদি। সগোত্রে বিবাহ এদের মধ্যে নিষেধ। বিবাহের সময় পুরোহিত প্রয়োজন। এঁদের পুরোহিতকে বলা হয় পাসকেল। এছাড়াও সমাজপতি বা গা-বুড়াদের প্রয়োজন হয় - যাদের সিদ্ধান্তে সমাজ চালিত হয়। এদের জীবনাচর্যা ও উৎসবের সঙ্গে শালগাছের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এরা মূলতঃ কৃষিজীবী। তবে বর্তমানে এরা শিক্ষিত হয়ে নানান পেশায় যুক্ত হচ্ছে। এদের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। ঘরে এরা নিজস্ব ভাষাতেই কথা বলে।

এগুলি ছাড়াও উত্তরবঙ্গে আরো অনেক জাতি জনজাতি রয়েছে যারা দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসতি স্থাপন করে আছে। তবে প্রত্যেকটি জনজাতিদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি থাকলেও বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সঙ্গে মিশে এদের সংস্কৃতি আজ লুপ্তপ্রায়, পরিবর্তন মুখী। এছাড়াও বাইরের রাজ্য কিংবা দেশ থেকে এখানে এসে অনেকেই বসতিস্থাপন করছে, ফলে এদের উপর চাপ পড়ায় এরা অর্থনৈতিক দিক থেকে কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, এতে নিজস্ব সংস্কৃতিতে ভিন্ন জনজাতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে একটি মিশ্র সংস্কৃতির সৃষ্টি করছে।

এই সব নানান জাতি-উপজাতিদের নিয়ে উত্তরবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলে নানান মিথ লুকিয়ে

আছে। এই ধরনের একটি মিথের কথা রিজলে উল্লেখ করেছেন তা হল যে মেচদের পূর্ব-পুরুষদেরকে ভগবান স্বর্গ থেকে মর্ত্য ভূমিতে পাঠিয়ে দেন। ফলে তারা তখন মর্ত্য ভূমির বারাণসীতে অবস্থান করেন। কিন্তু বারাণসী নিরূপিত স্থান ছিল না বলে তারা উত্তর দিকে চলতে থাকেন এবং বর্তমান কাছাড় জেলায় এসে উপস্থিত হন। সকলের ছোট ভাই বর্তমান থারু, মেচ তিনি কাছাড়েই থেকে যান, যিনি মেচ কোচ ও ধিমালদের আদি পিতা। অন্য দুই ভাই পাহাড়ের দিকে চলে যান, যাঁদের বংশধরগণ লিম্বু ও খাম্বু উপজাতি। এছাড়াও অশোক রায় প্রধান আরও একটি মিথের কথা বলেন। সেটি হল— " কোচ, মেচ, লিম্বু, লেপচে এই চার ভাই ভুটানের কোনো এক বথ হাচু পাহাড়ের উপর বাসা বেঁধেছিলেন।"[৫]

বর্তমান কোচবিহার বাদে উত্তরবঙ্গ পূর্বে পৌণ্ড্রদেশ নামে অভিহিত হত। পৌণ্ড্রদেশ, সমতট, তাম্রলিপ্ত, কামলংকা, কর্ণসুবর্ণ, হরিকেলা ও বাকলা এই সাতটি প্রধান রাজ্য নিয়ে গঠিত ছিল সমগ্র বাংলাদেশ বা বঙ্গদেশ। অবশ্য রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্গদেশের পাঁচটি রাজ্যের কথা বলেন তাঁর 'A Brief History of Ancient and Modern India'.[৬] গ্রন্থে। যথা— পৌণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ, কামরূপ বা আসাম, সমতট বা পূর্ববঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল এবং দক্ষিণ সমুদ্র উপকুলস্থ তাম্রলিপ্ত বা তমলুক। মুসলমান রাজত্বকালে পৌণ্ড্রদের জনপদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য। পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে পুণ্ড্রবর্ধন পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি বা পৌণ্ড্রভুক্তি নাম লাভ করে। "ক্রম বর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুণ্ড্র পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং গুপ্ত রাষ্ট্রের একটি প্রধান ভুক্তিতে পরিণত হইয়াছে। ধনাদহ, বৈগ্রাম, পাহাড়পুর তাম্রপট্টোলী, কয়টিতে এবং যুয়াঙ-চোয়াঙের বিবরণে এই পুণ্ড্রবর্ধন নামই পাওয়া যাইতেছে।... মোটামুটি সমস্ত উত্তরবঙ্গই বোধ হয় ছিল পুণ্ড্রবর্ধনের অধীন, একেবারে রাজমহল, গঙ্গা-ভাগীরথি তীর হইতে আরম্ভ করিয়া করতোয়া পর্যন্ত। কারণ যুয়াঙ-চোয়াঙ জঙ্গলে হইতে আসিয়াছিলেন পুণ্ড্রবর্ধনে এবং করতোয়া পার হইয়া গিয়াছিলেন কামরূপ। জঙ্গল এবং করতোয়া মধ্যবর্তী ভূ-ভাগই তাহা হইলে পুণ্ড্রবর্ধন।"[৭]

করতোয়া নদী বিধৌত দেশ-ই যে তৎকালীন পুণ্ড্রদেশ—এ সম্পর্কে নৈয়ায়িক রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 'তিথিতত্ত্বে'র স্নানমন্ত্রেও উল্লেখ আছে—

'করতোয়ে সদানীরে সরিশ্রেষ্ঠ সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রাণ প্লাবয়সে নিত্যং পাপ হরো করোদ্ভবে।।'

মহারাজ বল্লাল সেন যখন বঙ্গদেশকে 'রাঢ়' ও 'বারেন্দ্রভূমি' নামে ভাগ করেন তখন পৌণ্ড্রদেশ বারেন্দ্রভূমি নামেই পরিচিত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যাকে বলেছেন 'বারিন্দ'।

মগধ, উৎকল, কলিঙ্গ, মিথিলা এবং বাংলার বিভাগগুলিকে একত্রে বলা হত 'প্রাচী'। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে এবং জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে এই প্রাচীন ভৌগোলিক সীমার মধ্যে পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির উল্লেখ রয়েছে। এই পৌণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির একটি অঞ্চল বা মণ্ডলের নাম বরেন্দ্রী যা বর্তমানে রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত। তাই প্রাচীন বরেন্দ্রী, মণ্ডলের ইতিহাসই রাজসাহী বিভাগের বা উত্তরবঙ্গের প্রকৃত ইতিহাস বলে স্বীকৃত হতে পারে।[৮] প্রাচীন ভারতীয় বিভিন্ন পুরাণগুলিতে পুণ্ড্র অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। বায়ু ও মৎসপুরাণ এবং মহাভারতের আদিপর্বে বৃদ্ধ ঋষি অন্ধ দীর্ঘতমসের দ্বারা অসুররাজ বলির স্ত্রীর গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামক পঞ্চপুত্র প্রাপ্তির গল্প আছে। এই পঞ্চপুত্রের নামানুসারে বাসস্থানের ও অনুরূপ নামকরণ হয়। এই সূত্র ধরে পুণ্ড্রল নামটিও এসে যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি গল্পে (৭/১৮) ঋষি বিশ্বামিত্র একটি ছেলেকে দত্তক গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর নিজ পুত্রদের অসন্তোষ জেগে ওঠে এবং তারা পিতা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়ে পৃথিবীর প্রান্ত সীমায় উত্তরাধিকার লাভ করে। এই অভিশাপের দ্বারা বিশ্বমিত্র সম্ভবত নিম্নবর্ণত্ব প্রাপ্তির কথাই বলেছেন। তাঁর নিম্নবর্ণত্ব প্রাপ্ত পুত্ররাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ জনগোষ্ঠীর জন্মদাতা। এই ব্রাহ্মণে (৭/১৩-১৮এ) শুনঃশেফের কাহিনীতেই সর্বপ্রথম 'পুণ্ড্র' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দিব্যাবদানে'র পরিবেশিত তথ্য অনুসারে জানা যায় অশোকের সময়েই জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল এই উত্তরবঙ্গ। জৈন 'কল্পসূত্রে'ও এই একই কথা আছে। খ্রীঃপূর্ব দ্বিতীয়

শতকে বাংলাদেশে গঠিত চারটি জৈন কেন্দ্রের মধ্যে একটি ছিল উত্তরবঙ্গে। 'পুণ্ড্রাবর্ধনীয়' বলে যার উল্লেখ আছে। মহাভাষ্যকার কাত্যায়ন বার্তিকের উদাহরণে অঙ্গাঃ বঙ্গাঃ, সুহ্মাঃ পুণ্ড্রার উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত বার্তিক রচয়িতা এই অঞ্চলগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। 'আর্য মঞ্জুশ্রীমূল কল্প' গ্রন্থে গৌড়, পুণ্ড্র, ও সমতটের অধিবাসীদের ভাষাকে অসুর ভাষা বলা হয়েছে। 'মানব ধর্মশাস্ত্রে' ব্রাহ্মণ সংস্পর্শ শূন্য বৃষলত্ব প্রাপ্ত ক্ষত্রিয়গণের তালিকায় পৌণ্ড্রদের নাম আছে। মনুর স্মৃতিশাস্ত্রে পৌণ্ড্রগণ পতিত বা ব্রাত্যক্ষত্রিয়। মহাভারতের সভাপর্বে পুণ্ড্রদের যথার্থ ক্ষত্রিয় এবং এই অঞ্চলের করতোয়াকে তীর্থসলিলা বলা হয়েছে। এই গ্রন্থে কর্ণ, কৃষ্ণ ও ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে পুণ্ড্রদেশের যে বর্ণনা আছে তাতে এই অঞ্চলের সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করা যায়।

কালিকাপুরাণে উল্লেখ আছে কামতাপুর ও রাজবংশী প্রসঙ্গ। প্রাচীন শাস্ত্র পুরাণ স্মৃতি গ্রন্থগুলিতে পুণ্ড্র প্রসঙ্গ যেমন এই জনপদের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে তেমনি মহাভারতের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ এর শক্তি ও সম্পদের পরিচয় দেয়। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার গৌড়ে পালরাজাদের রাজত্বকালের সময়ে কোচ-সম্প্রদায় শক্তিসঞ্চয় করে। এই সময় কামরূপ অঞ্চলে অরাজকতার সুযোগে ক্ষমতা দখলের লড়াইএ অবতীর্ণ হয় অহোম, খেন, গারো, কাছারী, মেচ ও ভোট উপজাতি। অবশেষে কামরূপের পূর্বাঞ্চলের অধিকারী হয় অহোমরা এবং পশ্চিমাঞ্চলে খেন। খেন জনজাতির নীলধ্বজ তার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ধরলা নদীর পশ্চিম পার— কামতাপুরে। খেন বংশের রাজারাই কামরূপ থেকে রত্নপীঠকে পৃথক করে কামতা রাজ্য পৃথক ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। 'কামদা' বা গোঁসানী দেবী ছিলেন তাদের কুলদেবী। তাই রাজ্যের নাম কামতা এবং রাজধানীর নাম কামতাপুর। নীলধ্বজের পর বংশ পরম্পরায় কামতাপুরের শাসক হন চক্রধ্বজ এবং নীলাম্বর। খেন সম্প্রদায়ের মধ্যে নীলাম্বরই শেষ রাজা। এরপরে কামতাপুরের শাসনে আসে কোচ রাজবংশ যার নেতত্বে ছিল কোচ প্রধান হাজো মণ্ডল। হাজো মণ্ডলের দুই কন্যা হীরা ও জিরার বিবাহ হয় মেচ প্রধান হৈহয় বংশীয় হারিয়া বা হরিদাস মণ্ডলের

সঙ্গে। এই হরিদাস-এর ঔরসে জিরার গর্ভে চন্দন ও মদন এবং হীরার গর্ভে বিশ্য ও শিশ্য জন্ম নেয়। বিশ্য বা বিশ্বসিংহই হল কোচবিহার রাজসভার প্রথম শাসক এবং শিশ্যসিংহ অনুজের অনুকূলে সিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করে রাজছত্র ধারণ করেন এবং 'রায়কত' পরিবারের প্রধান এবং বংশানুক্রমিক প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। এরপর কালক্রমে স্বাধীন রাজ্য থেকে কোচবিহার একটি স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়।

তৎকালীন কামরূপ > কামতাপুর > কোচবিহার তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল রাজবংশীরাই। এছাড়াও বিভিন্ন উপজাতির বা জনজাতির বাস। রাজবংশী ব্যতীত অন্যান্য যে সব জাতি বা জনজাতি উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল— পলিয়া (জলপাইগুড়ি, মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর), বেলদার (মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর), ভুঁইমালী ও বিঁদ (মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর), দোসাদ (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার), তিয়র (মালদহ, দার্জিলিং), মুশাহার ও নুনিয়া (মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর)। এছাড়া কোচ, মেচ, থারু, ভুটিয়া, লেপচা, রাভা, গারো, টোটো ইত্যাদি মঙ্গোলয়েড জাতি এবং মুণ্ডা, সাঁওতাল, মাহালি, নাগাসিয়া, কোরা প্রভৃতি উপজাতি সম্প্রদায়ও কালক্রমে বসতি স্থাপন করেছে উত্তরবঙ্গে। দ্রাবিড় গোষ্ঠীর দুটি উপজাতি ওরাওঁ এবং মাল-পাহাড়ীরাও উত্তরবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতিতে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

একদা উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির ভিন্নমুখী সংস্কৃতিতে পরিচালিত ছিল কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজে রাজবংশীদের প্রাধান্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এরা অনেকেই মিশে গেছেন রাজবংশী জীবন প্রবাহে এবং কেউ কেউ লাভ করছেন রাজবংশী আত্মপরিচয়। এভাবেই আজ উত্তরবঙ্গে কোচ, মেচ, রাভা, ধিমাল, টোটো ইত্যাদি বিভিন্ন জনজাতি হয় রাজবংশীদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে নতুবা নিজস্বতা বজায় রাখতে পাড়ি দিচ্ছে অন্য কোনো অঞ্চলে। আর সেই কারণেই উত্তরবঙ্গের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা করতে গেলে মূল আলোচ্য হয়ে উঠে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কৃতি। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ছাড়া আর যে জনগোষ্ঠীর কিছুটা

প্রাধান্য দেখা যায় তা হল— ভারত ভাগের ফলে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অভিভাষী জনসমাজ।

ঘ. রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান ঃ

উত্তরবঙ্গে বসবাসকারী রাজবংশী পুরুষেরা পোষাক হিসাবে ব্যবহার করে নেঙটি (সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন যার ব্যবহার কমে এসেছে), শীতে পায়ে খরম, গায়ে 'গিলাপ' বা চাদর এবং রোদ বা বর্ষায় মাথায় 'মাথাল'। এছাড়া ব্যবহৃত হয় 'ঝাঁপি', যা মাথা থেকে শরীরের পিছনের অনেকটা অংশই ঢাকতে পারে।

রাজবংশী তথা উত্তরবঙ্গের জনজাতিরা মূলতঃ কৃষিজীবি। কৃষি ছাড়া অন্য যে সমস্ত কাজ তাঁরা করে সেগুলি হল— মাছ ধরা, তাঁত বোনা, সুতো তৈরি, এসব দিয়ে নানা ধরণের পোশাক তৈরি করা। যেমন— 'ফতা', 'গিলাপ', 'পাটানী', 'উড়নী', ' ঢোকরা' (পাটের তৈরি শীত বস্ত্র বিশেষ) ইত্যাদি। রাজবংশী পুরুষেরা পশুপালন বৃত্তিও করে থাকে। কর্মক্ষেত্রে রাজবংশী পুরুষ ও রমণী উভয়েই সমান পরিশ্রমী। 'মৈষাল' ও 'মাহুত' এই দুই বৃত্তিধারী মানুষ রাজবংশী সমাজে ছিল। উত্তরবঙ্গের লোকসংগীত তথা ভাওয়াইয়া গানে এই 'মৈষাল' ও 'মাহুত'-এর বৈচিত্র্যময় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় — যা বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীরই সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিফলন।

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর, মালদহ এইসব নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বহু বন্দর গড়ে উঠেছিল। বন্দর থেকে বন্দরে মোষ বা গরুর গাড়িতে মাল পরিবহন করতো 'গাড়িয়াল'। নৌকা চালানোর বৃত্তিতে 'নাইয়া', ব্যবসা বাণিজ্যে সাউদ বা সওদাগর, গরু চরানোর কাজে আখোয়াল বা রাখাল, মাছ ধরার কাজে মাছুয়া, চাষবাসে হালুয়া, সকলেই উত্তরবঙ্গের অর্থনীতিতে স্ব স্ব ভূমিকা নিয়েছে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের খাদ্যাভাসের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত ভাত, 'ছ্যাকা, (শাক), 'সিদোল' (মাছের তৈরি), 'ফোকদই', 'ত্যালানী', 'দই-চুরা', 'চাউল ভাজা' ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের জনসমাজ যেহেতু কৃষি নির্ভর ও গ্রামকেন্দ্রিক তাই এখানকার মানুষজনের মননে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন লোকাচার, লোকবিশ্বাস, সংস্কার। এই বিশ্বাস সংস্কারের দ্বারাই পরিচালিত হয় এতদঞ্চলের জনমানসের জীবনধারা।

ভারতবর্ষে আর্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে উত্তরবঙ্গের জনজীবনে নানা ধর্মাচরণ ও লোকাচারের প্রাধান্য দেখা যায়। উত্তরবঙ্গে আদিবাসীরা বিভিন্ন সময়ে দ্রাবিড়, আর্য, মঙ্গোলীয়, অষ্ট্রিক ইত্যাদি নানান শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, যার ফলস্বরূপ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে এসেছে মিশ্ররূপ। উত্তরবঙ্গের লোকেরা তাই গাছ, পাথর, নদী, বিভিন্ন অপদেবতা ইত্যাদির যেমন পূজা করে তেমনি আবার পূজা করে বিভিন্ন দেবদেবীরও। ধূপ প্রদীপ জ্বালিয়ে মূর্তি পূজার যেমন প্রচলন আছে তেমনি প্রচলন আছে পূজাকালে হোমাগ্নিরও। রাজবংশীরা আর্য অনার্য উভয় জাতির লোকাচারকে গ্রহণ করেছে; তেমনি আবার গ্রহণ করেছে শাক্ত বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের উপাসনার ধারা। এইভাবে দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মমত ও লোকাচার পুষ্ট হয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক অপরূপ দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে এই উত্তরবঙ্গ।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জনজীবনের বেশিরভাগ পূজা-পার্বণ সম্পাদিত হয় কৃষিকাজ বা উর্বরতাতন্ত্রের দ্বারা। যে সমস্ত লোকপূজা আমরা পাই তার মধ্যে বেশিরভাগই কৃষি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত আর প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত। এই কৃষিকাজের সাফল্য কামনায় প্রকৃতি পূজাও ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত হয়েছে।

কৃষিকাজের সঙ্গে জল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর এই জলকে কামনা করে রাজবংশী জনসমাজে যে সমস্ত পূজা বা লোকাচার পালিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হল— 'তিস্তাবুড়ি পূজা' বা ' মেচেনী খেলা', 'হুদুমদ্যাও' বা 'জলমাঙ্গা গান', 'ব্যাঙের বিয়ে', ' ভেদেই খেলা' তিস্তানদীর পূজাকে অঞ্চলভেদে তিস্তাবুড়ির পূজা বা 'মেচেনী খেলা' বা ' ভেদেই খেলা' বলে। এখানে ' খেলা' হল পূজার সঙ্গে সম্পর্কিত নৃত্য ও গীত। 'তিস্তাবুড়ির পূজা' বা 'মেচেনী খেলা' মেচ সম্প্রদায় থেকে উদ্ভুত। এর পেছনে রয়েছে এক পৌরাণিক কাহিনী। শোনা যায় শিব

একবার কৈলাসে যাওয়ার পথে দুই মেচ রমণীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে কৈলাশে না গিয়ে মেচ বসতিতে বাস করতে থাকেন। খবর শুনে গঙ্গা মেচ রমণীর রূপ ধারণ করে শিবের সঙ্গে মেচপল্লীতে মিলিত হন। এখানেই কার্তিক ও গণেশের জন্ম হয়। মেচপল্লীর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা নদী ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী পার্বতী ও গঙ্গার মিলিত রূপ। তাই মেচদের কাছে তিস্তা এক পবিত্র নদী। প্রচণ্ড খরায় ফসল বিপর্যস্ত হলে এই 'তিস্তাবুড়ির পূজা' রাজবংশী রমণীরা দলবদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করে।

জলপাইগুড়ি জেলায় 'মেচেনী খেলা' ও 'ভেদেই খেলা' এক হলেও কোচবিহারের হলদিবাড়িতে 'ভেদেই খেলা' বলতে স্বতন্ত্র এক 'খেলা'কে বোঝায়। সেখানে মাদার পীরের প্রতিভূ হিসাবে এক বাঁশের মাথায় নানা রঙের কাপড় বেঁধে সেটিকে নিয়ে ফাল্গুন মাসে ছেলেরা নাচ-গান করে গৃহস্থের দেওয়া চাল, ডাল, কলা ইত্যাদি সংগ্রহ করে। 'মদনকাম' বা 'বাঁশ পূজা' থেকে এই পূজা স্বতন্ত্র এক পূজা।

'হুদুমদ্যাও' বা 'হুদুমা খেলা'ও এক ধরণের জল কামনার পূজা। অমবস্যার অন্ধকার রাত্রে রাজবংশী নারীরা বিবস্ত্রা হয়ে মাঠের মাঝখানে কাচা বাঁশ গেড়ে কলসি জল ঢেলে নৃত্যগীতের মধ্য দিয়ে জল কামনা করে। এই পূজা পুরুষ বর্জিত। এখানে কাঁচা বাঁশ উর্ব্বরতাতন্ত্রের প্রতীক। মনে করা হয়, অতি প্রাচীন 'ফার্টিলিটি কাল্ট'-এর একটি রূপান্তরিত অবস্থা এই লোকাচার। এই 'হুদুমদ্যাও' দিনাজপুরে 'জলমাঙা গান' নামে পরিচিত। একটি গানে এই জল কামনার উল্লেখ পাই—

"আইস গে হালুয়া হুদুমা
তোক নামাম ভক্তি করিয়া সগায় মিলিয়া
আজি হাতে সংসারত তুই জল দে ঢালিয়া।"

'ব্যাঙের বিয়া'র মধ্য দিয়েও রাজবংশী সমাজে বৃষ্টির আহ্বান শোনা যায়। কৃষক রমণীগণ খোলা মাঠে দুটি ব্যাঙকে বর ও কনে সাজিয়ে বিয়ে দেন আর গান করেন—

"ব্যাঙের বেটির বিয়া গে, গালাত্ হাসুলী দিয়া গে
ও ব্যাঙি ম্যাগ দিচোনা কেনে।"

উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবী জনমানসের বিশ্বাস-এর মধ্য দিয়ে বৃষ্টি নেমে মাঠকে সুজলা-সুফলা করে তুলবে এই লোকবিশ্বাস থেকেই ব্যাঙের বিয়াও লোকাচারটি পালিত হয়। সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি এবং নীরোগ থাকার আকাঙ্খায় পালিত হয় 'বাঁশখেলা' বা 'মদনকাম পূজা'। ধান কাটার পর বৈশাখ মাসে এই পূজা হয়। সাতটি বাঁশের মাথায় চামর বেঁধে এবং রঙিন কাপড় জড়িয়ে নানা সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ছেলেরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচ-গান করে। এই সাতটি বাঁশ হল সাতটি দেবতার প্রতীক। যথা— শালশিরি, গারাম, সন্ন্যাসী, কালী, তিস্তাবুড়ি, বিষহরি ও মদনপীর। মদনপীর পূজার অন্যতম উপাদান হল গান—

"ভাটি হাতে আইল কুচুনী হাতে পিতলের খাড়ু
তায় সেনে বানাইতে পারে মদনকামের নাড়ু।"

এছাড়াও রয়েছে 'বাস্তু পূজা', 'গচিবুনা', 'ধরমঠাকুরের পূজা', 'চোর-চুরনী গান', 'মাশান পূজা', 'গেরাম ঠাকুরের পূজা' 'নয়া খাওয়া', 'সত্যনারায়ণ পূজা', 'ভাণ্ডানী পূজা', 'জিতুয়া দেবী পূজা' ইত্যাদি।

নৃত্যগীত ভিত্তিক অন্যান্য লোকাচারের মধ্যে রয়েছে ' সোনারায়ের গান', মালদহের 'গম্ভীরা', কুষান গান, জাগ গান, জলপাইগুড়ির গমীরা, পাঁচালী, বিভিন্ন মুখোশ নৃত্যগীত ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন ব্রতকথার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'সাইটোল' ব্রত, 'সুবচনি' ব্রত। এছাড়াও লোকায়ত শিবের 'শাল-শিরি' বা 'শালেশ্বরী' পূজা, গোরক্ষনাথের পূজা ও বিভিন্ন মন্ত্র-তন্ত্র, তুক্তাক ইত্যাদি উত্তরবঙ্গের লোকায়ত জীবনকে নানাভাবে ব্যাঞ্জিত করে তুলেছে।

ঙ. রাজবংশীদের নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর 'তারিকে আসাম', 'আলমগীর নামা', অষ্টাদশ শতাব্দীর 'রিয়াজ-উজ-

সালাতিন', ঊনবিংশ শতাব্দির মোর্সেদ জাহানারা প্রভৃতি মুসলমানী গ্রন্থগুলির বিবরণের মধ্য দিয়ে কামরূপের অধিবাসী হিসাবে কোচ, মেচ, রাভা, থারু ইত্যাদি মঙ্গোলীয় জাতির মানুষ জনের কথাই বলা হয়েছে। কেউ কেউ কামরূপের অধিবাসী হিসেবে পরবর্তীকালে রাজবংশী আত্মপরিচয়কারী জনগোষ্ঠীকে বলেছে বৃহত্তর বোডো জাতির শাখা, কেউ কেউ বলেছে কোচদের সঙ্গেই রাজবংশীদের সম্পর্ক। দ্রাবিড়দের থেকেও তাদের উৎপত্তির কথাও অব্যক্ত থাকে নি।

রাজবংশী জাতির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উদ্ধারের জন্য গবেষকদের অনুসন্ধানের শেষ নেই। ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটনের মতে কোচরাই উত্তরবঙ্গের আদি অধিবাসী। পরবর্তীকালে তারা রাজবংশীতে রূপান্তরিত হয়।[৯] বি. এইচ. হজসনের মতে কোচরা তামুলিয়ান গোষ্ঠীর শাখা। মহারাজা বিশ্বসিংহ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর থেকেই তাঁরা নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দিতে থাকে। ঐতিহাসিক (হান্টার সাহেব) মনে করেন রাজা বিশ্বসিংহ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণরা তাকে শিবের ঔরসজাত পুত্র বলে প্রচার করেন। হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেই তাঁরা কোচ নাম ত্যাগ করে হয়ে যান রাজবংশী বা রাজার বংশধর। তিনি আরও বলেন যে কোচ, মেচ, কাছারিদের সংমিশ্রণেই রাজবংশীদের উদ্ভব।[১০] নৃ-তাত্ত্বিক ডালটন, রিজলেও বেভারলি মনে করেন কোচদের রক্ত মূলত দ্রাবিড় রক্ত। আবার ওয়াডেল, ওডোনেল, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের মতে 'রাজবংশী'রা মূলতঃ কোচ। এই সব পরস্পর বিরোধী মতবাদের মধ্যে রাজবংশী জাতির প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া দুঃসাধ্য। তবে সব কিছু বিচার করে সামগ্রিক ভাবে এই অনুমান করা যায় দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে রাজবংশী জাতির উদ্ভব। পরবর্তীকালে তাদের সঙ্গে আর্য রক্ত মিশে গেছে। হিন্দু ধর্ম গ্রহণের মধ্যে দিয়েই রাজার সমস্ত আত্মীয়-প্রজারাও নিজেদের রাজবংশী পরিচয় দিতে শুরু করে।

এই নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয়ের থেকে বিভিন্ন অঞ্চলের রাজবংশীদের সম্পর্কে জানতে পারি।[১১] যেমন **মদাসী রাজবংশী**—এরা পশ্চিম আসামের মঙ্গোলীয় জাতির একটা অংশ। রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চাননের ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলনের পরে বিশ্ব শতকের চতুর্থ-দশক থেকেই সম্ভবত

রাজবংশীর দলে মিশে গেছে; এখন এরা রাজবংশী বা কোচ-রাজবংশী বলে পরিচয় দেয়; কিন্তু এদের নিয়ম নীতি অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশীদের থেকে আচার-বিচারে আলাদা। অসমের কোকরাঝাড় জেলার তিতাগুড়ির মদাসীরা ভুটিয়া রাজার পূজা করে। বিয়েতে শুয়োর বলি দেওয়ার প্রচলন রয়েছে এঁদের মধ্যে।

মদাসীর পরের অবস্থান শরণীয়া। এরা বৈষ্ণব ধর্মকে মেনে নিয়েছে। এদের পরবর্তী অবস্থা হল সরু কোচ। এঁরা মুরগী শুয়োর পোষে না, কিন্তু খায়।

উত্তর-পূর্ব ভারতে একটা আলাদা জাতি হল হাজং-রাজবংশী। এঁরা পশ্চিম অসামের কোকরাঝাড়, গোয়ালপাড়া, ধুবরী, বঙ্গাইগাঁও জেলা মেঘালয়ের তুরা ইত্যাদি অঞ্চলে বাস করে; সংস্কৃতি, ভাষা ইত্যাদির দিক থেকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সঙ্গে এদের অনেক সাদৃশ্য আছে।

জলদা বা জলধা নৃ-গোষ্ঠী মঙ্গোলীয় শাখার একটা অংশ। এক সময় পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকে জলদাপাড়ায় এঁরা বাস করতো সম্ভবত তাঁরা মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে চলে আসে অসমের বঙাইগাঁও, বিজনী, যোগীখোপা ইত্যাদির দিক থেকে। এদের পদবী সূত্রধর। ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলনের সময় বহু জলদা মানুষ উপবীত নিয়ে ক্ষত্রিয় হয়ে যায়।

কেউ কেউ মনে করেন প্রাচীন কালে মোরঙ্গীয়া বলে একটা মঙ্গোলীয়ান শাখা ছিল। যার সঙ্গে রাজবংশী সমাজের মিশ্রণে গড়ে ওঠে মোরঙ্গিয়া রাজবংশী সমাজ। কোনো কোনো পণ্ডিতের কথায় জানা যায় দার্জিলিং জেলার তরাই, নেপালের ঝাপা, মরং জেলার রাজবংশী সমাজের সঙ্গে কোনো ভাবে মিশে যায় থারু, ধিমাল জনজাতীর লোকেরা। দার্জিলিং, বিহার, নেপালের সিং পদবী যুক্ত মানুষগুলোকে এই গোত্রের মনে হয়। কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ি, কালাপানি এলাকায় বসবাস করে মোরঙ্গীয়া সমাজ। এদের পদবী দেব সিংহ। অন্যান্য জায়গায় রাজবংশী সমাজের মতো এঁরা শুয়োর খায়। বর্তমানে এই রীতি প্রায় নেই।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পূর্বদিকের ডুয়ার্স অঞ্চলে একসময় আধিপত্য ছিল ভুটানের। ব্রিটিশ

করদ রাজ্য কোচবিহার-এর সঙ্গে ভুটান রাজার বিরোধ বাধে। ডুয়ার্সের কোচদের মধ্যে কেউ কেউ ভুটানের সৈন্য হিসেবে যোগ দেয়। অবশেষে কোনো ভুটিয়া কন্যাকে বিয়ে করে তারা দোভাষিয়া রাজবংশী সম্মান লাভ করে। জলপাইগুড়ির মাঝের ডাবরি, সান্ত্রাবাড়ি, জামগুড়ি, ভেলুরডাবরি, ধূপগুড়ি, পারঙ্গের পার ইত্যাদি অঞ্চলে বহু দোভাষীয়া রাজবংশী মানুষ বসবাস করে। বর্তমানে তাঁরা বৃহত্তর রাজবংশী সমাজের সঙ্গে মিশে গেছেন।

পাল্কী বহনকারী কোচ, কাহার সমাজ রাজবংশী বলে পরিচয় লাভ করে এবং বৃহত্তর রাজবংশী সমাজে মিশে যায়। তারা ক্ষত্রিয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী আত্ম-পরিচয়ের দিকে ঝুকেছে।

মঙ্গোলীয় জাতি গোষ্ঠীর একটি শিকড় হল কোচ জাতি। ৪০-৫০ বছর আগেও জলপাইগুড়ি ও উত্তর/দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বাবু কোচ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে তারা সবাই রাজবংশী হিসেবেই পরিচিত।

পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেলার ইটাহার, কুশমণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ, হেমতাবাদ, রায়গঞ্জ, করণদিঘি থানার ভিতরে বাস করে দেশিয়া সমাজ। রিজলে সাহেব এদের কোচ শাখার অন্তর্গত বলে চিহ্নিত করেছেন। এই দেশিয়া রাজবংশী সমাজের লোকেরা দুই রকমের শ্রেণীতে বিভাজিত যেমন— 'বড় দেশী', 'ছড় দেশী'। বড় দেশীর মধ্যে 'ধানুয়া' হল মূল আর এর সঙ্গে আছে 'হাড়িগিল্লা'। গ্রামের কোনো মানুষ কুষ্ঠ রোগের মতন কঠিন রোগে মারা গেলে তাদের অশৌচ কর্ম করতে প্রয়োজন হয় এই 'হাড়িগিল্লার'।

পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র দিনাজপুর আর মালদা জেলায় বসবাসকারী মানুষজনের মধ্যে বেশিরভাগই পলিয়া রাজবংশী। ১৮৮১ সনে অবিভক্ত দিনাজপুরে এদের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। রাজবংশী পালিয়া দেশিয়ার মধ্যে বিবাহেও কোনোরকম বাধা ছিল না। ড. শিশির মজুমদার পলিয়া মানুষগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন— ক. মতুয়ান বা বাবু পলি, খ. সাধু পলি। এছাড়াও অন্যান্য ভাগের মধ্যে রয়েছে পানি পলিয়া, কইচ পলিয়া ইত্যাদি। নৃতাত্ত্বিক দিক দিয়ে

এরা কোচ জনজাতির শাখা। এদের পদবী রায়, বর্মণ, ক্ষত্রিয়, সিংহ। তবে পলিয়ারা এখন রাজবংশী আত্মপরিচয়ের দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে।[১২]

রাজবংশী সমাজের মূল স্রোত হল কোচ-রাজবংশী সমাজ। ইতিহাস থেকে জানা যায় কোচ রাজা বিশ্বসিংহের হিন্দুধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে কোচরা রাজবংশী হিসেবে চিহ্নিত হয়।

জলপাইগুড়ি জেলার বারোবিশা, কুমারগ্রামদুয়ারের আশে-পাশে ধুলিয়ারা ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সূত্র ধরে নিজেদের পূর্ব পরিচয় বাদ দিয়ে রাজবংশীর স্রোতে মিশে গেছে। রাজবংশী পরিচয়ধারী বিভিন্ন ভাগগুলি হল উত্তর দিনাজপুরের সোনাপুরে বসবাসকারী সামটিয়া, পশুচারণ, দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ির ঠুনঠুনিয়া এবং দার্জিলিং জেলার তরাই-খড়িবাড়িতে বসবাসকারী রাবনিয়া জনসমাজ।

মেচরাও কোচদের মতো মঙ্গোলীয় শাখার একটা ভাগ। কিন্তু সময়ের প্রবাহে মেচরা অসমে শরণীয়া আর পশ্চিমবঙ্গে ক্ষত্রিয়করণ-এর মধ্য দিয়ে রাজবংশী পরিচয় গ্রহণ করেছে।

এছাড়াও যারা রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গেছে তারা হল— ১. বাইদার বা বাজুনিয়া সমাজ (পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুরে দাস, হাজরা, ঋষি পদবীধারী), ২. রাজবংশী ভাষী মুসলমান সমাজ, ৩. খ্যান রাজবংশী, ৪. গেনগাই সমাজ ইত্যাদি।

স্থানিক পরিচয়ে রাজবংশী সমাজের যে প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় সেগুলি নিম্নরূপে বর্ণিত হল[১৩]—

১. ঝারুয়া রাজবংশী ঃ ঝার অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী সমাজ। যদিও আগের মতো সেই ঝারও নেই তাই ঝারুয়া অর্থও নিরর্থক হয়ে গেছে।

২. ঘুলিয়া রাজবংশী ঃ অসমের বিজনি রাজার এক্তিয়ারের জায়গা বা ঘুলিয়া পরগণায় বাস করা রাজবংশী সমাজ।

৩. মরঙ্গীয়া রাজবংশী ঃ নেপালের পূর্ব অংশ মরঙ্গ নামে পরিচিত। এই পরগণায় বসবাসকারী রাজবংশীরা মরঙ্গীয়া রাজবংশী নামে পরিচিত।

৪. রংপুরীয়া রাজবংশী ঃ রংপুর অঞ্চলে বাসকরা রাজবংশী। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার অসমের অবিভক্ত গোয়ালপাড়া যা দেশভাগের পূর্বে রংপুরের মধ্যে যুক্ত ছিল।

৫. সূর্যাপুরীয়া রাজবংশী ঃ বিহারের কিষানগঞ্জ, পশ্চিমবঙ্গের ইসলামপুর, সূর্যাপুর পরগণার অন্তর্গত। রাজবংশীরা পরিচিত হয়েছে সূর্যাপুরী রাজবংশী বলে।

৬. চরুয়া রাজবংশী ঃ চর অঞ্চলে বসবাসকারী রাজবংশী সমাজ। ব্রহ্মপুত্র নদীর পারে এখনো একটি চর আছে যার নাম রাজবংশীর চর। পশ্চিম অসমে সাপটগ্রামে কিছু মানুষ চর থেকে এসেছে এবং তারাই চরুয়া রাজবংশীর পরিচয় লাভ করেছে।

৭. ডখরিয়া রাজবংশী ঃ অসমের বঙ্গাইগাঁও জেলার ভিতরে ডখরা পরগণার রাজবংশীরা ডখরিয়া রাজবংশী নামে পরিচিত।

৮. বারোহাজারী রাজবংশী ঃ অসমের বঙ্গাইগাঁও, বৈঠামারী, অঞ্চলে যে সমস্ত মানুষ রাজার ফৌজ ছিল এবং রাজার ভালোমন্দ দেখাশুনা করতো তারাই বারোহাজারী রাজবংশী নামে পরিচিত।

রাজবংশী সমাজে আর্য সংস্কৃতির মতো বর্ণ বিভাজন ছিল না। কিন্তু আর্যীকরণের ফলে গোত্র হারিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কাশ্যপ গোত্র। বৈষ্ণবীয় ধারায় রাজবংশী সমাজে স্থান নিয়েছে 'অধিকারী' পদবীধারী সমাজ, অসমে মেধী, ভকত পদবীধারী। কেউ কেউ নিজের পদবী বর্জন করে বৈষ্ণবধারার পদবীকেই নিজের পদবী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এর সাথে সাথে চলে এসেছে শঙ্করদেবের 'শরণীয়াকরণ' কর্মসূচী। যার মধ্য দিয়ে বহু রাজবংশী মানুষ শঙ্করদেবের ভাবধারায় ঝুঁকে পড়েছে। অন্যদিকে আবার ক্ষত্রিয় আন্দোলনের প্রভাব অবিভক্ত গোয়ালপাড়ার খানিক অংশ, উত্তরবঙ্গ নেপাল, বিহার আর রংপুরের মানুষের মধ্যে এনেছে পরিবর্তনের জোয়ার। রাজবংশী সমাজের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিতকে এই আলোড়নগুলি বিশেষভাবে রদবদল করে ফেলেছে।

'রাজবংশী' অভিধাটি একেবারেই নতুন। বিভিন্ন পুরাতন পুথিপত্রে, মুসলমানী ইতিহাসে,

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে, দলিল, দস্তাবেজ, অনুশাসনে কোথাও রাজবংশী শব্দের উল্লেখ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত কোচ রাজবংশের পরিচয়জ্ঞাপক 'দরং রাজবংশাবলীতেও উল্লিখিত হয় নি। সর্বত্রই উত্তরবঙ্গবাসীদের জাতিগত পরিচয় দেওয়া হয়েছে কোচ, মেচ নামে। পণ্ডিতদের অনুমান একসময় বোডো (Bodo Group) জাতি সমগ্র অসম ও উত্তরবঙ্গে বৃহৎশক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। সম্ভবত সেই গৌরবময় অতীত সম্পর্কে সচেতন হয়েই তারা রাজবংশী অভিধাটি গ্রহণ করতে পারে। সমগোত্রীয় অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের জন্যই কোচরাই এই অভিধা গ্রহণ করেছিল বলে অনেকে মনে করা হয়।

চ. রাজবংশী পদবী, সংখ্যা গণনা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ঃ

রাজবংশী জাতির ইতিহাসকে জানতে গেলে তাদের পদবী পরিচয়ও জানা দরকার। শুধুমাত্র নাম দিয়ে একজন মানুষের সামগ্রিক জীবনকে কখনোই ধরা যায় না। এর সঙ্গে পদবীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই পদবীর মধ্য দিয়ে রাজবংশী জাতির পেশা ও ঐতিহ্য সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়। ভারতবর্ষ সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যবহৃত রাজবংশী পদবীর পরিচয়।[১৩]

বিহারে রাজবংশী পদবী ঃ

সিং
সিংহ — বীরত্ব ব্যঞ্জক
সিন্‌হা

পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনে যোগ না দেওয়া মানুষের পদবী 'দাস'। পুরোহিত শ্রেণীর পদবী 'দেবশর্মা', জমিদারের দেওয়া পদবী 'সরকার'।

পশ্চিমবঙ্গে রাজবংশী পদবী ঃ

কোচবিহার রাজাদের প্রদত্ত রাজবংশী পদবী—

মন্দিরের পুরোহিতের পদবী— 'দেউরী', কোচবিহার রাজার বংশধর 'নারায়ণ'। কোচবিহার রাজবাড়িতে পাখার বাতাসকারীর পদবী 'পাখাধরা'। খাজনা আদায় ও হিসাবরক্ষক - 'পাটোয়ারী'। লিস্করভোগী সামন্ত - 'লস্কর'। কোচবিহার রাজার কাছে যিনি গ্রামের প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি পান 'ঠাকুরিয়া'। কোচবিহার রাজার জামাই - 'ডাকুয়া'। নানান অনুষ্ঠানে যে কাজ করার মানুষ জোগার করে - 'বসুনীয়া'। প্রজাদের মধ্যে যে ভালো শিকার করে 'পোলান'। কোচবিহার রাজা বাইরে গেলে যে জামাকাপড় সাথে নিয়ে যায় - 'পোটলাধরা'। রাজপরিবারের কন্যাকে নিজ বংশ বাদ দিয়ে বা কোনো রাজ পরিবার বাদ দিয়ে অন্য জায়গায় বিয়ে দিলে কন্যার পদবী হয় 'ঈশোর'। কোচবিহার রাজার সঙ্গে অন্যকূলের মেয়ের বিয়ে হলে রাজার শ্বশুরের পদবী হয় - 'কার্যী'। রাজার মলমূত্র ত্যাগের সময় যে জলের পাত্র এগিয়ে দেয় - 'ঝারিধরা'। রাজবাড়ির অতিথি খাওয়ার সময় লাঠি নিয়ে যে কুকুর পাহারা দেয় - 'মান্তা'।

জলপাইগুড়ি রাজার দেওয়া পদবী ঃ

রায়কত - কোচবিহার রাজ্যের দূর্গ রক্ষাকারী।

কোঙর - কুমার

ঈশোর, কার্যী, বড়ুয়া পদবী - কোচবিহার রাজারা যেভাবে এরূপ পদবী দিয়েছিলেন সে রীতি অনুসারে।

ভুটান রাজার পদবী ঃ

উত্তরবঙ্গের উত্তর অংশে বহুদিন শাসন করেছিল ভুটানীরা। কোচবিহারের সঙ্গে চুক্তি হলেও সীমান্ত নিয়ে সমস্যার সমাধান হয় নি। অবশেষে ইংরেজদের হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান

হয়। কাজের ভিত্তিতে ভুটান রাজারা রাজবংশী ও বোড়োদেরকে বিভিন্ন রকম পদবী দিয়েছিল যেমন—

মণ্ডল - গ্রামের প্রধান

কাঠাম - বিচারক

বড়ুয়া - রাজার জামাতা

কার্যী - রাজার শ্বশুর

মল্লিক - A tahsildar who also had power to fine and imprison and to try cases of all kinds

গাবুর - মল্লিকের ছেলের পদবী

কায়েত - যে লেখাপড়া জানতো, পণ্ডিত।

বসুনীয়া - one who gets people to squat on lavel

জমাদার - A jamdder above a peon

দেউরী - মন্দিরের পূজারী

অন্যান্য পদবী ঃ

অধিকারী - বৈষ্ণবীয় ভাবধারার পূজারী শ্রেণী।

কীর্তনীয়া- 'মরা খোয়া' গান গায় যারা।

রায় - সংস্কৃত রাজা > প্রাকৃত রাআ > রায়। ক্ষত্রিয় আন্দোলনে যুক্ত হয়ে দাস কেটে রায় পদবী গ্রহণ করে।

প্রবাদ: দাস কাটিয়া নেখো ঠাসিয়া

রায়, সিংহ, বর্মণ কয়া গেইসে বাবু পঞ্চানন।

প্রধান - শ্রেষ্ঠ অর্থে

প্রামাণিক - বিয়েতে যে সাক্ষী থাকে।

বর্মণ - বর্ম, বর্মা- অর্থ রক্ষাকারী।

রাজবংশী সমাজে সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রেও বিশিষ্টতা লক্ষণীয়।[১৮] বিভিন্ন ধরণের হিসেব প্রচলিত আছে। যেমন—

ধানের হিসাবে ব্যবহৃত হয় — 'দন', 'সের', 'তোলা', 'ধারা', 'বিশ', 'পুরা' 'টালা' ইত্যাদি পরিমাপজ্ঞাপক শব্দ বা সংকেত।

পানের হিসাবে ব্যবহৃত হয়— 'গাণ্ডা', 'কড়া', 'পন', 'কাহন', ' মোঠা', 'টিসা' ইত্যাদি।

পাটের হিসাব হয়— 'মঠা', 'হাতা', ' পেট্টি', 'টাঙ' ইত্যাদি।

পশুর সংখ্যা 'পাল' শব্দে। ১৫/২০টা মহিষে হয় এক পাল।

রাস্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়— 'ফালং', 'মাইল', ' ক্রোশ' ইত্যাদি।

তেলের হিসাব— ' সের', 'তোলা' ' পেচি', ' পোয়া', 'বাসা' ইত্যাদি।

জমির হিসাব করা হয় যে সমস্ত শব্দে সেগুলি হল— 'দন', 'হাল', 'নল', 'টার', 'টারা', 'নল'।

হাতের মাপ— 'নেঙুল' (চাইর), ' টেকোর', 'চাপি', ' হোটা', 'ঠুসি' ইত্যাদি।

গহনার ক্ষেত্রেও রাজবংশী মহিলাদের বিশেষ ঝোঁক দেখা বিভিন্ন অলঙ্কারে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে বিভিন্ন ধরণের ধাতব গহনা পড়তে তারা খুবই ভালোবাসে। যেমন— নাকের গহনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

কানের গহনা ঃ অন্তিঃ গোল, মাকরী, ঝিঞ্জিরিঅলা, ঝিঞ্জিরিছারা, মাছিপাত, শুজি, চাকি, কানবালি, সাটকড়ি, পাম্বা, ফাসটি, খিরোল, চকিয়া।

আঙুলে - আংটি।

কোমরে - গোট, বেট।

পায়ে - খারু, ঠ্যাঙ খারু, মল, পাওপাতা।

পায়ের আঙুলে - পাইজো, পাজোর, পাঞ্জা ইত্যাদি।

এই সমস্ত গহনার নক্সার ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় রাজবংশী নন্দনতত্ত্ব এবং নৃতাত্ত্বিক পরিচয়। নক্সাগুলো উঠে এসেছে বিভিন্ন গাছ-গাছালি, পোকামাকর, ফুল, পাতা থেকে। যেমন— বিরুয়া, ধানসিসা, পানপাতা, মাকরী, কদমফুল ইত্যাদি, যা রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতিতে মূল্যবান।

ছ. রাজবংশী সমাজের ভাষা ঃ

রাজবংশী ভাষা বাংলার ভাষাবিদ্দের মতানুযায়ী বাংলা ভাষারই ঔপভাষিকরূপ। ভাষাবিদ্ সুকুমার সেন এই উপভাষাকে 'কামরূপী' রূপে চিহ্নিত করেছেন। সাম্প্রতিককালে এই ভাষায় সাহিত্যচর্চা এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষণীয়। ফলে এই ভাষা ক্রমশ ভিন্ন মাত্রায় তথা ভিন্নতর ভাষিক অবস্থানে রূপান্তরিত হতে চলেছে। উল্লেখ্য, রাজবংশী ভাষার বাচকগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজ ছাড়াও স্থানীয় মুসলমান, যুগী, তেলী, গেনগাই ইত্যাদি সমাজে ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে, সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আজ রাজবংশী ভাষা উত্তরবঙ্গের বৃহত্তর বাচকগোষ্ঠীর ভাষায় রূপান্তরিত। এর অন্যতম একটি দিক রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন। রাজবংশী প্রবাদের ভাষাশৈলীর মধ্যে নিহিত আছে রাজবংশী সমাজের কথ্যভাষার নানা দিক। যথা— ক. ধ্বনিগত, খ. রূপগত, গ. বাক্যগত এবং ঘ. শব্দার্থগত।

বক্তার মনন, চিন্তন, অনুভবের নিজস্ব প্রকাশ রীতিই হচ্ছে শৈলী। রাজবংশী কথ্যভাষায় বক্তার ধ্বনিগত নানা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এক এক ভাষায় এক এক রকমের বাগ্ধ্বনি তাৎপর্যপূর্ণ, ধ্বনিগুলি হল সেই ভাষার মূল স্বনিম। ধ্বনিবিজ্ঞানীরা ধ্বনির বিভিন্ন দিকের বর্ণনা করেই ধ্বনির শ্রেণী বিভাগ করে থাকেন। শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাগ্যন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কিংবা কোন বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে প্রাণ বায়ুর মৃদু কম্পাঙ্ক যখন বাতাসে ভাসতে ভাসতে শ্রোতার কানে গিয়ে বাজে তখন আমরা তাদেরকে বলি বাগ্ধ্বনি। শ্বাসবায়ুর গতিপথে বাধার স্থান, পরিমাণ ও প্রকৃতির বিচার করেই ধ্বনির শ্রেণী বিভাগ করা হয়। শ্বাসবায়ুর

গতিপথ লক্ষ করে ধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা— ক. অন্তর্গামী ধ্বনি (Ingressive), খ. বহির্গামী ধ্বনি (Egressive Sound)। মুখ গহ্বরের ফাঁকা জায়গা কোনো দিক দিয়ে চাপের ফলে কমে এলে শ্বাসবায়ুর উপর চাপের সৃষ্টি হয় ফলে শ্বাসবায়ু ঘণিভূত (compressed) হয়ে মুখ বা নাসিকা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে যে ধ্বনির সৃষ্টি করে তাকেই বহির্গামী ধ্বনি (Egressive Sound) বলা হয়। যেমন— অ, আ, ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, প, ম, ন ইত্যাদি। অপরপক্ষে মুখগহ্বরের মধ্যে ফাঁক স্থানটুকু কোন কারণে প্রসারিত হয়ে গেলে মুখ গহ্বরে অবস্থিত শ্বাসবায়ু অ-ঘণীভূত বা পাতলা (rarefied) হয়ে যায় এবং বাইরের বাতাস এইসব স্থানে ঢুকে গিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে অন্তর্গামী ধ্বনি (Ingressive Sound) বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ সমৃদ্ধ ভাষায় বহির্গামী ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও অন্তর্মুখী বা অন্তর্গামী ধ্বনির ব্যবহার সচরাচর প্রত্যক্ষ করা যায় না।

ধ্বনিসত্ত্বার স্বরূপ (Nature of Phonetic) বিশ্লেষণ করে ধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— বিভাজ্য ধ্বনি ও অবিভাজ্য ধ্বনি। বিভাজ্য ধ্বনিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে; স্বরধ্বনি (Vowel Sound), ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant Sound)। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানী বানার্ড ব্লক এবং জর্জ এল ট্রেগার (Bernard bloch and George L. Trager) উভয় ধ্বনির পার্থক্য নির্দেশ করে স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির একটি মোটামুটি সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—

'A vowel is a sound for whose production the oral passage is unobstructed, so that the air current can flow from the lungs to the lips and beyond with out being stopped with out having to squeeze through a narrow constriction, with out being deflected from the median line of its channel, and without causing any of the supraglottal organs to vibrate; it is typically but not necessarily voiced.' এবং 'A consonant ... is a sound for

whose production the air current is completely stopped by an occlusion of the laryns or the oral passage, or is forced to squeeze through a narrow constriction or is deflected from the median line of its channel through a lateral opening, or causes one of the supraglottal organs to vibrate.'[১৪]

স্বরধ্বনির উচ্চারণের কাল-পরিমাপ ও স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর গতিপথের আকৃতি বিশ্লেষণ করে বাংলার মতো রাজবংশী ভাষার স্বরধ্বনির শ্রেণী বিভাগ করা যেতে পারে—

স্বরধ্বনির শ্রেণী বিভাগ ঃ

সম্মুখ স্বরধ্বনি ঃ

ই, এ, অ্যা।

কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি ঃ

আ।

পশ্চাৎ স্বরধ্বনি ঃ

উ, ও, অ।

রাজবংশী ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ

রাজবংশী স্বরধ্বনিগুলি যথাক্রমে— ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ। নিম্নে স্বরধ্বনিগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল—

ই-ধ্বনি ঃ রাজবংশী ভাষায় শব্দের আদি স্বর রূপে 'ই'-এর উচ্চারণ লক্ষণীয়। যেমন— ইমরা, ইচরা, তেমনি ব্যঞ্জনযুক্ত 'ই' ধ্বনির ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন— বিলাই, সিদল, চিরকিনা ইত্যাদি।

এ-ধ্বনি ঃ শব্দের আদিতে অপরিবর্তিত রূপে এ-ধ্বনির ব্যবহার দেখা যায় রাজবংশী কথ্যভাষায়। যেমন— এদোন, এত্‌তি, এইক্‌না ইত্যাদি। তেমনি ব্যঞ্জনযুক্ত এ-ধ্বনির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— বেটা, বেটি, নেঙগুর ইত্যাদি।

অ্যা-ধ্বনি ঃ রাজবংশী কথ্যভাষায় 'অ্যা' একটি মূল স্বরধ্বনি। শব্দের আদিতে ও পদান্তে ব্যঞ্জনযুক্ত 'অ্যা' ধ্বনির ব্যবহার প্রচুর। যেমন— চ্যাংরা, প্যালকা, চ্যালা, পাইস্যা ইত্যাদি।

আ-ধ্বনি ঃ বাংলা ন্যায় রাজবংশী কথ্যভাষায় আ-ধ্বনি অপরিবর্তিত রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা— আজেলা, আভং, আটুশ ইত্যাদি। তেমনি ব্যঞ্জনযুক্ত 'আ' ধ্বনির ব্যবহারও লক্ষণীয়। যেমন— সাঙনা, সাগাই, তামান ইত্যাদি।

অ-ধ্বনি ঃ রাজবংশী কথ্যভাষায় 'অ'-ধ্বনিটি অবিকৃত রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন— অত্‌লা, কল, অজাগা ইত্যাদি।

ও-ধ্বনি ঃ রাজবংশী ভাষায় ও ধ্বনিটি শব্দের আদিতে অপরিবর্তিত রূপে যেমন উচ্চারিত হয়, তেমনি এই ভাষার কথ্য রূপে ব্যঞ্জন যুক্ত 'ও' ধ্বনিটির ব্যবহারও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেমন— ওরস, ওচলা, ওচায়, ভোক, দোস কোই ইত্যাদি।

উ-ধ্বনি ঃ 'উ' স্বরধ্বনিটি শব্দের আদিতে অবিকৃত ভাবে উচ্চারিত হয়। যেমন— উরুন, উটকন, উত্‌তি, উসটা ইত্যাদি। ব্যঞ্জনযুক্ত 'উ' ধ্বনির ব্যবহারও রাজবংশী কথ্যভাষায় প্রচুর পরিমানে লক্ষণীয়। যেমন— হুদুম, শুটকা, গুলগুলা ইত্যাদি।

রাজবংশী কথ্যভাষায় অনেকাংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তন দেখা যায়। নিম্নে কতগুলি উদাহরণের সাহায্যে স্বরধ্বনির পরিবর্তন দেখানো হল—

ই-ধ্বনির পরিবর্তন ঃ

ই > এ ঃ ইনদুর > এন্দুর/এনদুর।

সিনদুর > সেনদুর।

ই > উ ঃ মরিচ > মরুচ।

এ-ধ্বনি পরিবর্তন ঃ

এ > অ্যা ঃ এমন > অ্যামন।

চেতন > চ্যাতন।

দেশ > দ্যাশ।

শেষ > শ্যাষ।

এ > ই ঃ মেশিন > মিশিন।

খেজুর > খিজুর।

এ > আ ঃ বেগুন > বাগুন, বাইগন।

অ্যা-ধ্বনির পরিবর্তন ঃ

অ্যা > এ ঃ ব্যাগ > বেগ।

আ-ধ্বনির পরিবর্তন ঃ

আ > অ ঃ মায়া > ময়া।

পানতা > পনতা।

আগুন > অগুন।

মাসি > মসি।

আ > ও ঃ মাসি > মসি > মোসি।

আগুন > অগুন > ওগুন।

অ-ধ্বনির পরিবর্তন ঃ

অ > ও ঃ অসুখ > ওসুখ।

অভাগিনী > ওভাগিনী।

অনাচার > ওনাচার।

অজিত > ওজিত।

অ > আ ঃ কপাল > কাপাল।

কথা > কাথা।

সাহস > সাহাস।

অ > উ ঃ হনুমান > হুনুমান।

অ > র ঃ অবোধ > রবোধ।

ও-ধ্বনি পরিবর্তন ঃ

ও > অ ঃ ওসতাদ > অসতাদ।

বোকা > বকা।

পোকা > পকা।

সোজা > সজা।

উ-ধ্বনি পরিবর্তন ঃ

উ > ও ঃ মুঠা > মোঠা।

জুতা > জোতা।

সুতা > সোতা। ইত্যাদি।

রাজবংশী ভাষার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি হল—

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ভ, ম, ব, ল, শ, স, হ, ব (v/w), য় (/J), ওয় (o/w)।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণী বিভাগের মানদণ্ড দুটি। যথা—

ক. উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী (Places of Articulation),

খ. উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী (Nature of Articulation)।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. ওষ্ঠ্য ধ্বনি ঃ প, ফ, ব, ভ, ম।

২. দন্ত্য ধ্বনি ঃ ত, থ, দ, ধ।

৩. দন্তমূলীয় ধ্বনি ঃ র, ল, ন।

৪. তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি ঃ চ্, ছ, জ, ঝ্, শ, য় (J)।

৫. স্নিগ্ধ তালব্য/কণ্ঠ্যধ্বনি ঃ ক, খ, গ্, ঘ, ঙ।

৬. ওষ্ঠ্য তালব্য ধ্বনি ঃ ওয় (o/w)।

উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা—

১. নাসিক্য ধ্বনি ঃ প্রতিটি বর্গের পঞ্চম ধ্বনি। যেমন— ঙ, ঞ, ম, ণ, ন।

২. মৌখিক ব্যঞ্জন ধ্বনি ঃ প্রতিটি বর্গের পঞ্চম ধ্বনি ছাড়া বাকি সব মৌখিক ব্যঞ্জন ধ্বনি। যেমন— ক, ঘ, চ, ঝ।

৩. কম্পিত ধ্বনি ঃ র।

৪. উষ্মধ্বনি ঃ শ্, স্, হ।

৫. ঘৃষ্ট ধ্বনি ঃ চ, ছ, জ, ঝ।

৬. সঘোষ ধ্বনি ঃ বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি। যেমন— ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ।

৭. অঘোষ ধ্বনি ঃ বর্গের চতুর্থ ও পঞ্চম ধ্বনি। যেমন— গ, ঘ, জ, ঝ, ড, শ, , ভ ইত্যাদি।

৮. অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঃ বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি। যেমন— ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ ইত্যাদি।

৯. মহাপ্রাণ ধ্বনি ঃ বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি। যেমন— খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

রাজবংশী কথ্যভাষার রূপগত বৈশিষ্ট্য ঃ

যে কোন ভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনা বলতে মূলত সেই ভাষার লিঙ্গ, বচন, উপসর্গ,

অনুসর্গ, সর্বনাম, কারক ও বিভক্তি, ক্রিয়াপদ, ধাতু ও ক্রিয়া পদের আলোচনাকেই বোঝায়। রাজবংশী কথ্যভাষায় রূপগত বৈশিষ্ট্যের নানা পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে রাজবংশী কথ্যভাষার রূপগত দিকের আলোচনা করা হল—

রাজবংশী ভাষায় লিঙ্গের ব্যবহার লক্ষণীয়। স্ত্রীলিঙ্গ বাচক প্রত্যয়— আনী, নী, ই, ঈ এবং পুরুষ বাচক প্রত্যয়— আ। অনেক সময় 'বেটি' ও 'মরদ' শব্দ দুটি স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। 'বেটি' শব্দটি শব্দের আদিতে যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ গঠন করা হয়। যেমন— 'বেটিছাওয়া'/ 'বেটিছুয়া'। তেমনি 'মরদ' শব্দ যোগে পুংলিঙ্গ শব্দের উদাহরণ 'মরদছাওয়া', 'মরদ-লোকলা' (অর্থ— পুরুষ মানুষেরা)।

রাজবংশী ভাষায় বচন দুই প্রকার— একবচন, বহুবচন। একবচনে প্রাণীবাচক শব্দের ক্ষেত্রে 'টা' ব্যবহৃত হয়। যেমন— গরুটা, মানষিটা প্রভৃতি। তেমনি বহুবচনে পদ বা শব্দের শেষে — গুলা, গিলা, লা প্রত্যয় যুক্ত করা হয়। যেমন— গরুগুলা, সতীনগুলা, মানষিগিলা, চ্যাংড়াগিলা, মানষিলা ইত্যাদি।

রাজবংশী কথ্যভাষায় অপ, উপ, ভর, অন্ উপসর্গের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও অ, আ, বিনা এবং নি উপসর্গেরও ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন— অপমান, উপকার, অনদেখা, অনদিশা, অকাম, আকাম, বিনা পাইসা, নিপুত্রা ইত্যাদি।

উপসর্গের মতো এই কথ্যভাষায় বিভিন্ন অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— আগোত, পাছোত, সাথ, পাকে, আবিনে, এছাড়াও এই ভাষার কথ্যরূপে কয়েকটি বিশিষ্ট অনুসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন— তনে/তানে, দাতি, বগল, ভিতি, হাতে, থাকি ইত্যাদি।

রাজবংশী ভাষায় বচন ও পুরুষ ভেদে সর্বনামের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

উত্তম পুরুষ বাচক সর্বনাম ঃ

একবচন ঃ মুই, মোহ, মোক্, মোর ইত্যাদি।

বহুবচন ঃ আমরা/আমরালা/হামরালা/হামরা/হামা/হামাক/হামাকঘর ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ বাচক সর্বনাম ঃ

একবচন ঃ তুই, তোক, তোমাক, তোমার।

বহুবচন ঃ তোমরা, তোমারঘর, তোমারগুলাক, তোম্হা।

প্রথম পুরুষ বাচক সর্বনাম ঃ

একবচন ঃ অয়/তায়/তাঁয়/তাঞ/উয়ায় /তোম্রা।

বহুবচন ঃ ওমহা/ওমরা/ওমরালা/উমরা/উমারলা/তোমরাগুলা।

এছাড়াও রাজবংশী কথ্যভাষায় আরও কতগুলি সর্বনাম দেখা যায়। যেমন—

সাকল্য বাচক সর্বনাম ঃ সউক, সগ, সউগ, সোগ, সৌগ প্রভৃতি।

প্রশ্নাত্মক সর্বনাম ঃ

একবচন ঃ কায়/কাঁয়।

বহুবচন ঃ কারঘর/কারলা।

এই ভাষার কথ্য রূপে সর্বনাম রূপে 'ক্যানে' 'কিতায়'-এর ব্যবহার চোখে পড়ে। যেমন—

'কিতায় রে তুই নাই আসিলো', 'ক্যানে তুই যাবার নইস।'

স্থানবাচক সর্বনাম ঃ

কোথায় অর্থে ঃ কোটে/কুটে/কোন্ঠে/কুনঠি, কুত্তি।

এইখানে অর্থে ঃ এঠি/এইঠে/এইঠেন/ হেত্তি/ হেটে/ হেঠি।

ঐখানে অর্থে ঃ হুত্তি/হুত্থি।

কালবাচক সর্বনাম ঃ কখুন/কেৎখুনা/কুনঘরি/কুনব্যালা।

তখন অর্থে ঃ তখুন/ত্যাখন/উব্যালা/স্যালা/স্যালায়।

এখন অর্থে ঃ এখুন/এলায়/এ্যালা/এ্যালায়।

দূরত্ববাচক সর্বনাম ঃ ক্যাতদূর/ক্যাতেদূর/ কোৎদূর।

পরিমাণ বাচক সর্বনাম ঃ এত্লা/এ্যাতলা/অত্লা/তামান্/সগ্লা, যত্লা, কত্লা ইত্যাদি।

রাজবংশী ভাষায় কর্তা, কর্ম, করণ, নিমিত্ত, অপাদান ও অধিকরণ এই ছয়টি কারকেরই ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কর্তৃ কারকে শূন্য বিভক্তি ও বিশেষ ক্ষেত্রে 'এ', 'য়' বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন—

১. মুই ভাত খাচু।

২. বাঘে মানষি খায়।

কর্ম কারকে 'ক' বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— 'যদুক ডাকে আন।'
রাজবংশী ভাষায় কর্ম কারকে শূন্য বিভক্তির ব্যবহারও দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে একটি প্রবাদ উল্লেখ করা যেতে পারে—

'আগা দেখ পাছা দেখ
দুধ খাবু তো ভাসা দেখ।'

করণ কারকের বিভক্তি চিহ্নরূপে এ, ত, ত এবং দি/দিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন— 'ঘাসে জমিখান ঢাকি গেইল।' নিমিত্ত কারকে 'এ, ক, জইন্যে, বাদে, নাগি, গোনে প্রভৃতি বিভক্তির ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন— 'দায়ে মরে হাতি/ বেদায় মরে কুত্তা' (এ বিভক্তি)

রাজবংশী কথ্যভাষায় অপাদান কারকে 'থাকি'/'থাকিয়া', 'তকা', 'তি'-এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন—

'উপর তি পড়িল ধুম
ধুম কয় মোর কোটিখান শুন।'

অধিকরণ কারকে বিভক্তি চিহ্ন হিসেবে এ, ত, টে, ঠে, ঠি প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যায়। যেমন—

'বাইগনত্ বিচি নাই।'

সম্বন্ধ পদের ক্ষেত্রে র-কার যোগ করে সম্বন্ধ পদ গঠিত হয়। যেমন— 'নারীর শোভা উচল খোপা'। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগেই গঠিত হয় ক্রিয়াপদ। এই ক্রিয়াপদের দুটি রূপ — সমাপিকা ক্রিয়া ও অসমাপিকা ক্রিয়া। রাজবংশী ভাষায় অনেকগুলি মৌলিক ক্রিয়াপদের পরিচয় পাওয়া

যায়, যেগুলি এই ভাষায় বিশিষ্টতার পরিচায়ক। সেই ক্রিয়াপদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য— উবা (বহন করা) উক্‌টা (খোঁজ করা) উক্‌রা (তুলে ফেলা) উলটাং ভেলটাং (এলোমেলো করা) ওচলা (উপরে উপরে পরিস্কার করা) প্রভৃতি।

রাজবংশী ভাষায় ক্রিয়াপদের তিনটি কাল — বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ। পুরুষ ও কালভেদে ক্রিয়াপদের রূপ পরিবর্তিত হয়। এই ভাষায় ধাতুর সঙ্গে — 'ই', 'এ', 'ইবা', 'বা' বিভক্তিগুলি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয়। যেমন— করি, ধরি ইত্যাদি।

রাজবংশী ভাষায় কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। '-আ', '-আল', '-ইল', '-ইয়া' যোগে কৃৎ প্রত্যয় গঠিত হয়। যেমন— রান্‌ধা (রন্‌ধন + আ)। এই ভাষায় তদ্ধিত প্রত্যয়গুলি হল— '-ই', '-উ', '-তি', '-আল্‌', '-আলা', '-ইল' প্রভৃতি। যেমন— আন্‌ধার + উ = 'আন্‌ধারু'।

রাজবংশী কথ্যভাষায় বাক্যগত বৈশিষ্ট্য ঃ

বাক্যেব দুটি রূপ— গঠনগত ও অর্থগত। গঠনগত দিক থেকে বাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— ১. সরল বাক্য, ২. জটিল বাক্য এবং ৩. যৌগিক বাক্য।

তেমনি অর্থগত বা ভাবগত দিক থেকে বাক্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা— ১. সদর্থক বাক্য, ২. নঞর্থক বাক্য, ৩. প্রশ্নবোধক বাক্য এবং ৪. অনুজ্ঞাবাচক বাক্য।

যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটি মাত্র বিধেয় পদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তাকে সরলবাক্য বলা হয়। যেমন— গরুটা ঘাস খাছে। এখানে 'গরুটা' উদ্দেশ্য পদ এবং 'ঘাস খাছে' বিধেয় পদ।

যে বাক্যে এক বা একাধিক 'আকাঙক্ষা' যুক্ত অ-প্রধান বাক্য খণ্ড নিদের্শক সাপেক্ষ সর্বনাম পদের দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি বাক্য গঠন করে তাকেই জটিল বাক্য বলা হয়। রাজবংশী ভাষায় সেই নিদের্শক সাপেক্ষ সর্বনাম পদগুলি হল— 'যেইটে- সেইটে', 'য্যালা-স্যালা', 'যেটা-

সেটা', 'কে-তে' ইত্যাদি। উদাহরণ — 'য্যালা তুই আসিবু, স্যালা মুই যাইম।'

পরস্পর নিরপেক্ষ একাধিক স্বাধীন বাক্য যখন অব্যয় যোগে মিলিত হয়ে একটি বাক্য গঠন করে সেই বাক্যকে যৌগিক বাক্য বলা হয়। রাজবংশী ভাষায় যৌগিক বাক্যের অব্যয় রূপে— কিন্তুক, তনে, ভালা, মানা, তাহো, ফের, আর ইত্যাদি অব্যয় বাচক শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন— 'তুই যা ভালা, মুই পরে যাইম।'

রাজবংশী ভাষায় নঞর্থক বাক্যের ক্ষেত্রে 'না' বা 'নি' প্রধানত ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যেমন— 'মুই এলা না খাইম্'।

কিন্তু কোন কোন সময় এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। 'না' ক্রিয়াপদের পরে বসে। যেমন— 'মুই কাম কইরবার যাবার নঙ।'

প্রশ্নবোধক বাক্যের ক্ষেত্রে কাঁয়, কে, ক্যানে, কোন্-ব্যালা ইত্যাদি শব্দ ক্রিয়াপদের পূর্বে বসে। যেমন— 'তুই ক্যানে আসিলু না?'

অনুজ্ঞাবাচক বাক্য

উদাহরণ ঃ

কামখান করেক্। তোম্হা কামখান কইর্বেন্।

তুই ঝট্ করিয়া বাড়ি যাইস্।

আজি না দ্যাঙ্ কালি/কালি ডিমার দামটা নেইস্।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঃ

উফাং ফাং, ফাং ফাং, উসাং সাং, খালাউ খালাউ, চল্চল্, ঠন্ঠন্, খাচাংখাচাং, গবগবা, ফকফকা, হলফল ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের অবস্থান, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও রাজবংশী জনসমাজ বিষয়ক আলোচনায়

উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রকৃতি, নদনদী, উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, রাজবংশী প্রবাদ-প্রবচন বিশ্লেষণে অপরিহার্য। রাজবংশী সমাজের নৃ-গোষ্ঠীগত ও সামাজিক অবস্থান এবং ভাষিক বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন না করলে প্রবাদ-প্রবচনের অন্তর্লোককে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। তাই প্রাসঙ্গিক ভাবে উক্ত বিষয়গুলির আলোকে একটি বিশেষ নির্দেশিকা এখানে উঠে এসেছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১. দাশ, ড. নির্মল - উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, সাহিত্য বিহার, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ১।

২. তদেব, - পৃ. ২

৩. রায়, ড. দীপক কুমার - লৌকিক দেবদেবীর আত্মীয়স্বজন, 'নাজ', দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর, ২০০৮, আকাশ মৃত্তিকা, পৃ. ৪৪।

৪. দাশ, ড. নির্মল - উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, সাহিত্য বিহার, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫।

৫. রায় প্রধান, অশোক - ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গ ও রাজবংশী, রয়াল পাবলিশার্স, কল-১৩, ২০০৬, পৃ. ১১০।

৬. Datta, Ramesh Chandra - A Brief History of Ancient and modern India, 1962, p. 43.

৭. রায়, ড. নীহাররঞ্জন - বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব, প্রথম দে'জ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০০, পৃ. ১৫৪।

৮. সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র - উত্তরবঙ্গের সংক্ষিপ্ত পুরাতত্ত্ব, পৃ. ১৪৪।

৯. Hamilton, F. Bucanon - Account of the District of Rongpure, 1810.

১০. Hunter, W. W. - Statistical Account of Bengal, Vol-X, Re print, Delhi, D. K. Publishing house, 1974, p. 347-348.

১১. রায়, ড. দীপককুমার - রাজবংশী সমাজ আরো সংস্কৃতির কাথা, সোপান, কলকাতা, মে, ২০১২। পৃ. ১৪-১৫।

১২. তদেব, - পৃ. ১৭-১৮।

১৩. তদেব, - পৃ. ১৪-১৫।

১৪. Bloch, Bernard and George, L. - Outlines of Linguistic Analysis New Delhi : Oriental Books Reprint 1972, p. 18.